EDITION 11 • APRIL 2022
MOIRANG DIWAS EDITION

FORWARD

REBUILDING INDIA IN NETAJI'S WAY

REBUILDING INDIA IN NETAJI'S WAY

Cover Photo:
Rajdeep Saha - Netaji Collected Works

Photo taken in mid-1930s. Subhas Bose travelled to Europe, visited Indian students & European politicians, researched and wrote the first part of "The Indian Struggle". Published in London in 1935, the British government banned the book in the colony out of fears that it would encourage unrest.

Tribute to
THE INDIAN NATIONAL ARMY
ON 78TH MOIRANG VIJAY DIVAS
FORWARD

আমাদের কথা

অশোচয়ানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।

তুমি যখন জ্ঞানের কথা বলছো, তখন তুমি সেই জন্য শোক করছেন যা শোকের যোগ্য নয়। যারা জ্ঞানী তারা জীবিত বা মৃত - কারোর জন্যই বিলাপ করে না।

এই বছরটি আমাদের সকলের কাছে খুবই বিশেষ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবর্ষের আনুষ্ঠানিক উদযাপন গত ২৩শে জানুয়ারী সমাপ্ত হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্মান জানানো সমাপ্ত হলেও, সুভাষবাদী রূপে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এখানেই সমাপ্ত নয়। আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে একসাথে কাজ করে যেতে হবে নেতাজীর দেখানো পথে ও সুভাষের পথে ভারত পুনর্গঠনের লক্ষ্য সফল করতেই হবে।

১৪ই এপ্রিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার দিন। ১৯৪৪ সালে এই দিনটিতে আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারত-ভূখণ্ডে প্রথমবার আজাদ হিন্দের পতাকা উত্তোলন করেছিল। স্থান মৈরাং। ফরওয়ার্ড মিডিয়া গ্রুপ ভারতবর্ষের মুক্তিদাতা, শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু, ও তাঁর মুক্তিবাহিনীকে ৭৮তম মৈরাং বিজয় দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধা জানায়। এই শুভ দিনটিকে স্মরণ করার জন্য আমরা ফরওয়ার্ড ওয়েবজিনের ১১তম সংস্করণ নিয়ে এসেছি।

প্রথমদিন থেকে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে প্রচুর ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছি। আমরা তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা তাঁদের ব্যস্ত কর্মসূচী সত্ত্বেও এই ওয়েবজিনে তাঁদের জ্বলন্ত লেখা ও মন মাতানো চিত্রাবলী প্রদর্শন করেছেন। আমরা প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং আমাদের সাহায্য করেছেন। আপনারাই আমাদের শক্তি। আপনাদের ছাড়া আমরা কিছুই না। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে পাঠকদের কাছ থেকে আমরা ভালোবাসা সাড়া পাব।

জয় হিন্দ!
ফরওয়ার্ড এডিটোরিয়াল টিম
ফরওয়ার্ড ওয়েবজিন
১৪ই এপ্রিল ২০২২

EDITORIAL NOTE

aśhochyān-anvaśhochas-tvaṁ prajñā-vādānśh cha bhāṣhase_ gatāsūn-agatāsūnśh-cha nānuśhochanti paṇḍitāḥ

While you speak words of wisdom, you are mourning for that which is not worthy of grief. The wise lament neither for the living nor for the dead.

This year, marking the conclusion of Netaji Subhas Chandra Bose's 125th birth anniversary celebrations, is very special to all of us. But although the celebrations end, our duty as sincere Netajians doesn't end here. We must work hand in hand in the Liberator's path and work hard to fulfil our goal to Rebuild India in Netaji's Way.

The 14th of April is a red letter day in the history of Indian Independence Movement. On this day back in 1944 the Azad Hind tricolour was first hoisted on a liberated soil of India's mainland (Moirang) by the Indian National Army. Forward Media Group pays heartiest tribute to the Liberator and his Liberation Army on the 78th Moirang Vijay Diwas. To commemorate this auspicious day, we bring to you the 11th edition of our prestigious Forward Webzine.

Since our initial days we have recieved immense love and support from our readers. We thank our contributors who, despite their busy schedule, have beautifully presented their flaring write-ups in our webzine. We thank each and everyone who stood beside us and let us be what we are today. You are our strength. We are nothing withour you. We hope to recieve huge response from our readers in future.

Jai Hind!
Forward Editorial Team
Forward Webzine
14th April 2022.

CONTENTS

THE LEGEND

THE TALE OF BLOOD

চিত্রকলা

THE LEGEND

বীর সুভাষের মহান দেশ (পর্ব ১)

RAJDEEP SAHA

[নেতাজীর বিরুদ্ধে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতি]

ঘটনাটির সূত্রপাত ১৯৯৫ সালে। একদল জাপানী যুদ্ধ-প্রবীণ, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানায় নেতাজীর চিতাভস্ম জাপানের রেঙ্কোজি মন্দির থেকে যেন ভারতে আনা হয়। অনতিবিলম্বে আলোচনা সভা বসে যায় রাজধানী দিল্লীতে। সভায় উপস্থিত থাকেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি. ভি. নরসিংহ রাও, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস. বি. চৌহান, বিদেশ মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সহ প্রধানমন্ত্রী দফতরের সব বড় বড় সচিবরা। Intelligence Bureau (IB)-র তরফ থেকে খুবই সদ্বিবেচনামূলক উত্তর আসে: "যদি চিতাভস্ম ভারতে আনা হয়, তাহলে জনগনের, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গবাসীর, ধারণা হবে যে নেতাজীর মৃত্যুরহস্যের সরকারী থিওরি (অর্থাৎ বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটেছে) তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" (অনুবাদিত) IB-র উত্তরের প্রাসঙ্গিক ইংরেজী অংশটুকু দেওয়া হল (সূত্র: নেতাজী সংক্রান্ত Top Secret Files ভারত সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রকাশিত) । তবে বিদেশ মন্ত্রকের (Ministry of External Affairs) তরফ থেকে বিপরীত উত্তর আসে, অর্থাৎ "নেতাজীর চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হোক।" তারা তাদের পরবর্তী কর্মসূচিও তৈরি করে ফেলে। সবচেয়ে মজার ব্যপার হল তাদের কর্মসূচি অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই বিতর্ক চিরকালের মতো সমাপ্ত করার জন্য সর্বসম্মতি প্রয়োজন ও তাদের মতে সর্ব-ভারতীয় স্তরে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা Parliament-এ দাঁড়িয়ে সরকারকে অনুরোধ করতে পারে সেই বিতর্কিত চিতাভস্ম ফিরিয়ে আনার জন্য। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন – নেতাজীর এই বিতর্কিত চিতাভস্ম জাপানে অবস্থিত হলেও, খাতায়-কলমে এর সম্পূর্ণ হেফাজত ভারত সরকারের কাছে। অর্থাৎ এটি ভারতে ফিরিয়ে আনতে হলে

আমাদের আবেদন করতে হবে ভারত সরকারের কাছে, জাপান সরকারের কাছে নয়; এটি ভারতে কবে ও কিভাবে আনা হবে তা সম্পূর্ণ ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত, জাপান সরকারের এই বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ নেই।

Views of MEA and IB

7. The Ministry of Home Affairs has obtained the views of MEA and IB. IB's views are to the effect that it would not be advisable to take any initiative to bring back the ashes to India as there is no demand from any quarter for this. If the ashes are brought to India, the People of West Bengal are likely to construe it as an

F.No.I/12014/27/93-IS(D.III)
Ministry of Home Affairs

- :4: -

imposition on them of the official version of Netaji's death.

Excerpt from Top Secret files showing stand of MEA & IB

IB ও MEA-র এই মতভেদের সমাধান করার জন্য, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি মন্ত্রীপরিষদের সামনে পেশ করেন। সভায় স্বরাষ্ট্রসচিব কে. পদ্মনাভাইয়া একটি Top Secret নথি পেশ করেন যা থেকে এই মামলার পটভূমি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব এবং স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের প্রতিটি সরকার নেতাজীর মৃত্যুরহস্যকে কোন চোখে দেখেছে ও কিভাবে পরিচালনা করেছে তা বোঝা যাবে। ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিদেশ মন্ত্রককে (প্রণব মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা পরিচালিত) নির্দেশ দেয় – তাইহোকু বিমানবন্দরে সুভাষ বসুর মৃত্যুর প্রমাণ হিসাবে যত জাপানী নথিপত্র আছে, তার একটি অনুলিপি যেন তাদের দেওয়া হয়।

বিদেশ মন্ত্রকের এক কথার উত্তর ছিল এই যে তাদের কাছে এমন কোন নথি সহ প্রমাণ নেই। প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীপরিষদ অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিষয়টি স্থগিত রাখা হোক এবং নেতাজীর চিতাভস্ম সেই মুহূর্তে ভারতে আনা সম্ভব নয়। তবে বাঙালীর একগুঁয়েমি তো সবারই জানা। সমস্যা হয় যখন এই একগুঁয়েমির পেছনে কোন খারাপ মতলব কাজ করে। ১৯৪৭ থেকে কংগ্রেস সরকারের অন্যতম ঘৃণ্য প্রচেষ্টা হচ্ছে কিভাবে বিমান দুর্ঘটনার থিওরি জনগনের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া যায়। প্রণব মুখোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি তাঁর বাঙালী সত্তাকে উপেক্ষা করে প্রাধান্য দিলেন তাঁর কংগ্রেসদরদী সত্তাকে। হয়তো তাঁর কাছে কোন অতি গোপন তথ্য ছিল কিংবা তাঁর কোন এক অতি বিশ্বস্ত কংগ্রেসবাদী ভাই হয়তো তাঁকে বলে দিয়েছিল "প্রমাণের তোয়াক্কা করো না, সুভাষ বসু তাইহোকু বিমানবন্দরেই মারা গিয়েছিলেন।" একবার ভেবে দেখুন একটি দেশের বিদেশ মন্ত্রী সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করছে। "সাত কটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ কর নি।" ১৯৫৫ সালের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সময় ধরে প্রণব মুখোপাধ্যায়, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে ও ব্যক্তিগত খরচয়, এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে

TOP SECRET IMMEDIATE
COPY NO. 9

No.6/CM/95(iii)
GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)

NEW DELHI, the 6th February, 1995.
17 Magha, 1916 (S).

The following will constitute additional item on the agenda for the meeting of the Cabinet scheduled to be held at 1145 hours, on Wednesday, the 8th February, 1995 in the Conference Room (No.155) South Block, New Delhi :-

S U B J E C T S

5. Proposal to bring the mortal remains of Netaji Subhash Chandra Bose from Japan to India. (Note dated 2.2.1995 (CD-92/95) from the Ministry of Home Affairs, attached). — MINISTER OF HOME AFFAIRS.

(D.M.N. RAO)
Deputy Secretary to the Cabinet.
Tele : 3015802

To

Principal Secretary to the Prime Minister.
Secretary to the Prime Minister.

Copy, with enclosure, forwarded for information to the following :-

Secretary, Ministry of Home Affairs. (Sponsoring).

Foreign Secretary.

(D.M.N. RAO)
Deputy Secretary to the Cabinet.

GSH
15 Copies.

TOP SECRET

PM orders Home Minister to place the issue in the Cabinet

প্রথমে তিনি যান টোকিও। সেখানে জাপানের বিদেশ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করে তিনি চলে যান জার্মানি। একাধিক সরকারি নথিপত্র আছে যা থেকে প্রমাণ করা যায় যে তিনি সেখানে সুভাষ বসুর তথাকথিত কন্যা, অনিতা পাফ, ও তথাকথিত স্ত্রী এমিলি শেঙ্কলের সঙ্গে দেখা করেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা প্রয়োজন এমিলি ও অনিতা কি আদেও সুভাষের স্ত্রী-কন্যা, তাদের আসল পরিচয় কি; এই সকল প্রশ্ন ভিন্ন প্রসঙ্গের ও আলাদা ভাবে আলোচনার দাবি করে। তাই আজ এ' বিষয়ে আলোচনা না করে আমি স্ত্রী ও কন্যার আগে 'তথাকথিত' শব্দটি ব্যবহার করছি। আশ্চর্যজনক ভাবে নেতাজীর মৃত্যু রহস্যের প্রতি মা-মেয়ের সম্পূর্ণ

ভিন্ন মতামত। এমিলি শেঙ্কল তাঁর জীবনকালে কোনদিনই বিশ্বাস করেননি যে সুভাষ জাপানে মারা গেছেন (হয়তো এই কারনেই পণ্ডিত নেহেরু জার্মানিতে গয়েন্দা পাঠিয়েছিলেন)। অন্যদিকে অনিতা পাফ্ বিমান দুর্ঘটনার থিওরিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী (তাঁর পেছনেও গোয়েন্দা ছিল, ছোট ছিলেন তো টের পাননি, তাঁর মা আগলে রেখেছিলেন)। খুব স্বাভাবিক ভাবেই পরিবারের সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে পূর্ণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন অনিতা পাফ্। এমিলি শেঙ্কল মারা যান ১৯৯৬-এর মার্চ মাসে; মৃত্যুর আগে তিনি আরও একবার উপভোগ করেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অতিষ্ঠ করে তোলা ব্যবহার। তিনি যদি নারী না হয়ে পুরুষ হতেন তাহলে আমি এতো বাক্যব্যয় করতাম না। নেতাজী শিখিয়েছেন নারীর সম্মান সবার উর্ধে। তিনি সুভাষ বসুর স্ত্রী নাই হতে পারেন, নাই থাকতে পারে তাঁর সাথে ভারতবর্ষর কোন সম্পর্ক, তাঁর সব-চেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন নারী – মায়ের জাত – তাঁকে অসম্মান করার অধিকার আমাদের কারোর নেই। সেই ৮৪ বছর বয়সী বৃদ্ধার সাথে প্রণব মুখোপাধ্যায় যেরূপ নিম্নব্যবহার করেন, তার নুনতমও যদি আমার লেখার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়, তাহলে আমার এই লেখনি সার্থক হবে। তিনি এমিলিকে জোর করেন একটি কাগজে স্বাক্ষর করার জন্য যাতে রেঙ্কোজি মন্দিরে রক্ষিত সেই চিতাভস্ম ভারতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নেতাজীর চিতাভস্ম হিসাবে। এককথায় ঐ চিতাভস্ম যে বাস্তবে নেতাজীরই তার প্রমাণ হিসাবে তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন এমিলিকে। কিন্তু এমিলি রাজি হলেন না। অপরদিকে প্রণব বাবুও পরাজয়ের পাত্র নন। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হল। তিনি বৃদ্ধাকে একটি Blank Cheque দিয়ে বলেন যে তিনি যে কোন জাতীয় মুদ্রায় যে কোন পরিমানে অর্থ পেয়ে যাবেন শুধুমাত্র একটি স্বাক্ষর করার বদলে। লজ্জায় অপমানিত এমিলি Cheque-টি মুহূর্তে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন এবং কংগ্রেসের গুপ্তচরকে অনুরোধ করেন ভবিষ্যতে কোনদিন যেন তাঁকে বিভ্রান্ত না করা হয়।

এই ঘটনাটি জনসমক্ষে আসে ২০০০ সালে; সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র অমিয়নাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্যকুমার বসু ৬ই মার্চ জাস্টিস মুখার্জী কমিশনের সামনে একটি Affidavit পেশ করেন। সেই Affidavit-এ স্বাক্ষর করেন জার্মানির Consulate General of India-র অফিসের Vice Consululate.

Ministry of External Affairs, Government of India, Mr Pranab Mukherjee's visit to Augsburg on 21 October 1995

1. On 20 October 1995 Auntie rang me up after 10:30pm from her daughter Anita Pfaff's home in Augsburg. She was quite agitated. She told me that Mr Pranab Mukherjee was coming to Augsburg on 21st October 1995 to convince her and Anita to give their approval for bringing the so-called "ashes" of Netaji to India. Mr Mukherjee also wanted her to sign a document which he could take back to India as proof of her approval. She again emphasised to me that she had never believed in the plane crash story and would neither sign any document nor agree in any way to bringing the "ashes" to India or to anywhere else.

2. On 21 October 1995 Anita and her husband Dr Martin Pfaff had to take Mr Mukherjee out for lunch as auntie could not tolerate any discussion on the so-called "ashes" in her presence. Auntie told Pranab Mukherjee quite clearly that she did not believe that Netaji had died in a plane crash… and that those "ashes" … had nothing to do with Subhas.

ঠিক এক দশক পর মুখার্জি কমিশনের (নেতাজীর মৃত্যু রহস্য সমাধানের জন্য ভারত সরকার দ্বারা গঠিত তৃতীয় কমিশন) রিপোর্ট জমা পড়ে সরকারের কাছে; ৮ই নভেম্বর ২০০৫। কমিশনের সম্মুখে যেই সাতজন সাক্ষী বিমান দুর্ঘটনার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তার অন্যতম ছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। জাস্টিস মনোজ মুখোপাধ্যায় সুদক্ষ ভাবে বিচার করেন তার সামনে থাকা সমস্ত নথিপত্র। এমনকি পূর্ব দু'টি কমিশনের (শাহ্ নাওয়াজ কমিশন ও জি. ডি. খোসলা কমিশন) তুলোনায় এই কমিশনের রিপোর্ট ছিল অনেক বেশি অন্বেষিত ও নিরপেক্ষ। কিন্তু নিয়তির কি অদ্ভুত পরিহাস। রিপোর্টটি যখন সরকারের কাছে

জমা পড়ে তখন মন্ত্রীপরিষদের শীর্ষাসনে রয়েছেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। এই যুদ্ধ তো শুধুমাত্র (জাস্টিস) মুখোপাধ্যায় বনাম (মন্ত্রী) মুখোপাধ্যায় কিংবা বাঙালী (বসু) বনাম বাঙালী (মুখোপাধ্যায়) ছিল না; এটি ছিল আরও অনেক বড় এক রাজনৈতিক যুদ্ধ যা আমি আগেই বলেছি। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কমিশনের রিপোর্ট খারিচ করার সম্ভাবনা ছিল চূড়ান্ত। ১৭ই মে ২০০৬ -এ রিপোর্টটি Parliament-এ পেশ করা হলে সরকার তা নাখোচ করে দেয়। জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ দেখা দেয়। পরবর্তীকালে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের উত্তর ছিল এই যে "... We wanted a discussion on the report but the Bharatiya Janata Party (BJP) stalled the debate."

(...চলবে)

Sources: India's Biggest Cover Up (by Anuj Dhar); Declassified Netaji files placed in National Archives issued in public interest; web articles of Hindustan Times & TOI.
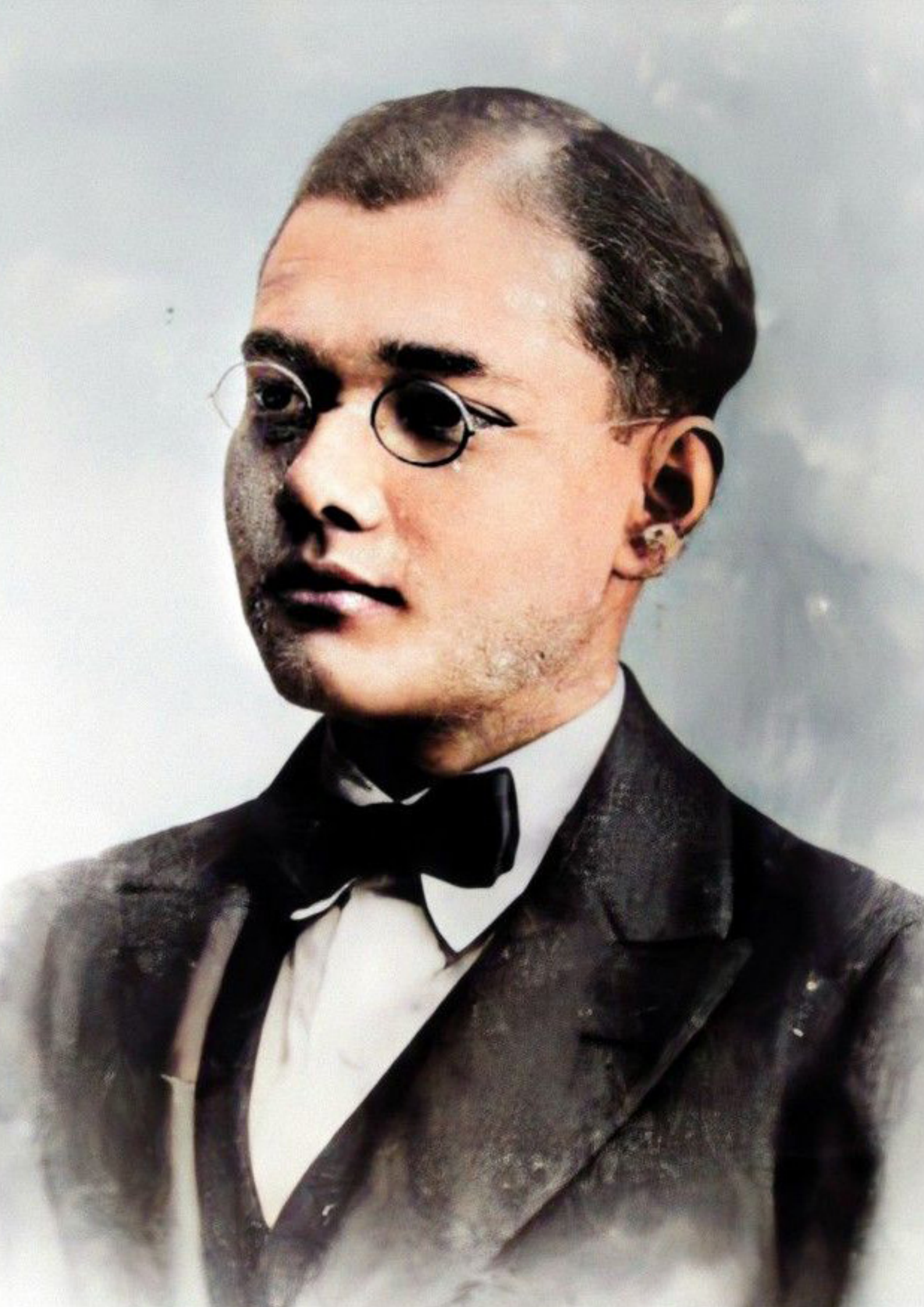
NETAJI: A TRUE INSPIRATION

KAUSANI SAHA

"Netaji". This word, " Netaji". Hearing this word every Indian feels an unexplainable pride; emotion that is indescribable. Not only did he inspire Indians, but also left the whole world in awe. Describing Netaji through words, definitely is not possible because there always remains an itch in our heart that we missed something, some value truly important regarding him. Netaji Subhas Chandra Bose's political views were in support of complete freedom for India with a society and state socialism at the earliest. Even after abounding his political view, a man of praiseworthy wisdom and influence as well as moral ethics. Netaji had the capability to think straight even in tough situation. In fact, ones that will never get him in trouble in the far future.

He is criticized by many even after his struggle just because he used violence as a method to gain independence for India. But here lies the twist. He knew when to act violently and when not. He was hardly a teen when he left home and started gathering allies and food to feed the poor, homeless people on the streets of India.The oppressed, exploited Indians under the British rule were blended by Netaji kind and open heart. He could have easily ganged up on the local police station and brought the farmer justice, but his decision to instead follow this method shows that he was nothing but desperate and left with the only choice of gaining independence through violence.

While we're at that, let's not forget that his range of thinking was wide enough to reach countries far away such as Germany and Japan. His 'Confidence' is not to be underestimated, taking such a huge risk of getting caught on his plan failing, he still travelled such a long distance to shake hands with the then current terror. Adolf Hitler known as the person who was so intimidating that one could not raise his eyes up to him, Ne-

taji went with a proposal of friendship to this man. The level of influence our Netaji has, is beyond imagination to think that at such a crucial time when the countries were already tensed by the World War, he reached Germany and Japan to gather an army who would readily and rapidly fight for the Indian Independence. Holding such influence, but alone on foreigners who have nothing to do with our country, is a “hats off”, here itself.

Again, he wasn’t only busy planning attacks but also had wide knowledge about the current scenario in the world around him. Using political relationships to his advantage, is again, a great applause worthy move.

Confidence, wisdom, influence, knowledge, spirit, kindness, motivation the lust goes on. A few pages aren’t enough to express my respect for this legend.
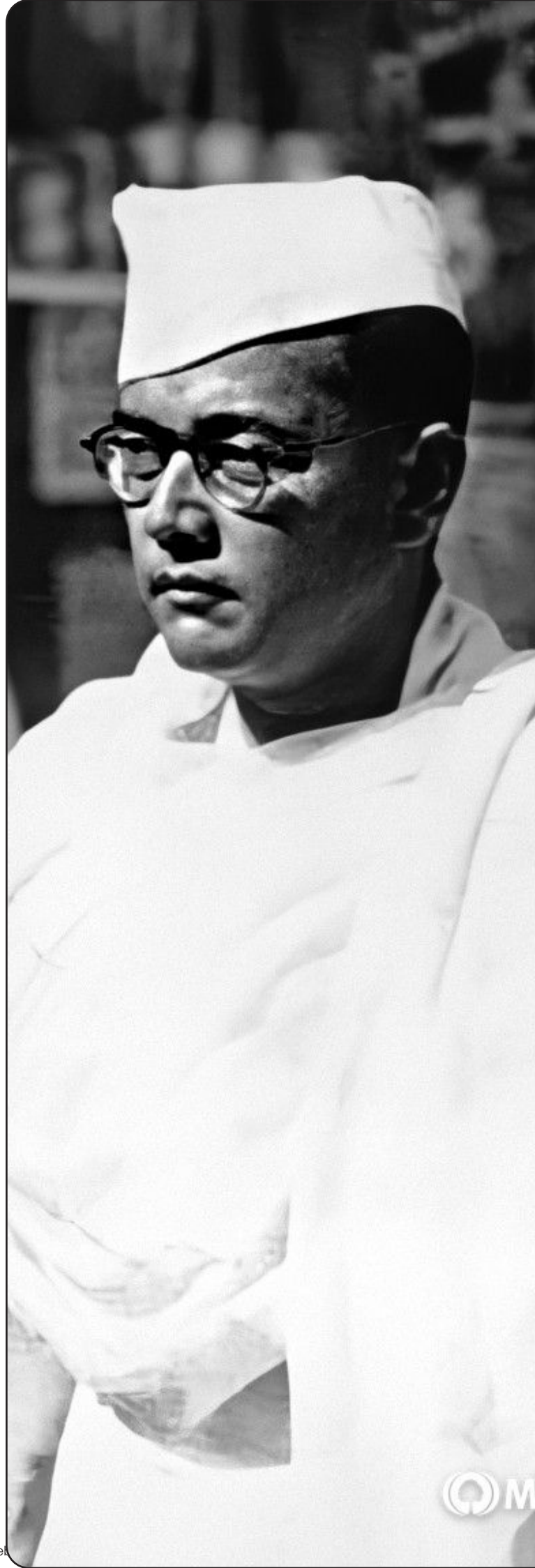
THE PERPETUAL ANGEL

Sonela Sengupta

As your tiny footsteps embark on the paths of school
I welcome you with the echoes of patriotism in the assembly.
As years pass by and mind opens up for wisdom of the world
I wait for you in the yellow pages of library.
Then comes the moment of your rendezvous with me.
I long to tell you my saga
But the moment you turn the pages, many illuminated faces allure you up
And send me to the abyssal dungeon of nowhere.

Do not think I am gone
I rise with each dawn and fill every corner of the earth with light
In the darkest hour of night I shine like a moon among the stars.
I am with you
I shower my blessings on you with the incessant drops on leaves
My words reach you with the chirping of birds.
Beyond the vision of what you see and perceive
I breathe in the hearts of thousands and still continue to live.
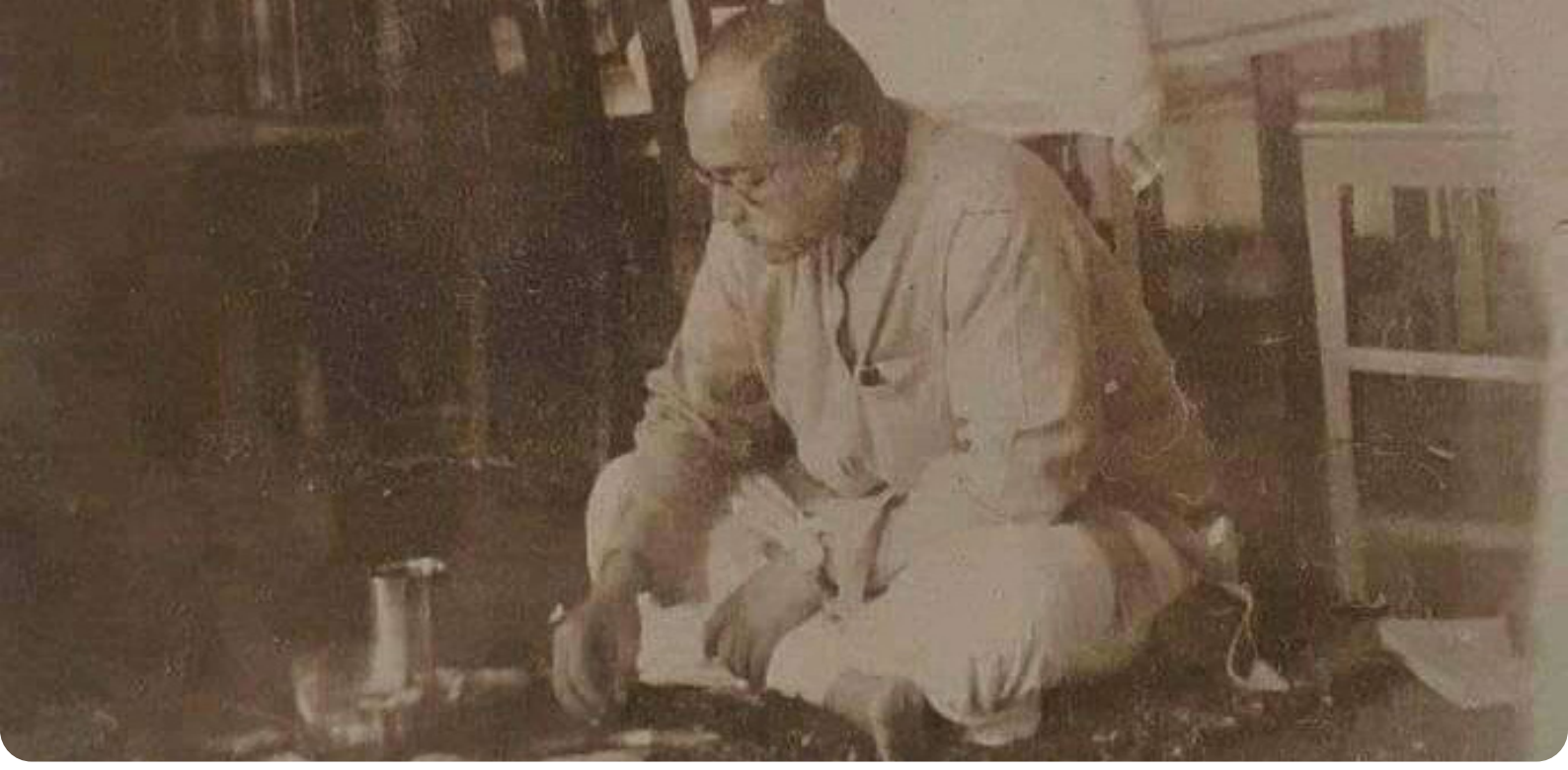
বাঙালিয়ানা ও সুভাষচন্দ্র

PABRISHA DAS

পরণে ধুতি-পাঞ্জাবী এবং গলায় সাদা শাল। বাঙালীর যেন এক অন্যতম সাজ। সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে দিয়ে যেন সেইরকমই এক খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচয় পাওয়া যায়।

চব্বিশ পরগণায় বাঙালীর সর্ব বিখ্যাত 'মহীনগরের বসু পরিবার'-এ সুভাষ বসুর জন্ম হয়। বাঙালী ও কায়স্ত পরিবার। তিনি সঠিকভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপিয়ান স্কুলে ইংরেজি লিখিত ও কাব্য-ল্যেটিন, বাইবেল সহবত শিক্ষা, ব্রিটিশ ভূগোল এবং ব্রিটিশ ইতিহাসের পাঠ্যলাভ করলেও, কোন ভারতীয় ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা না থাকায়, বাংলা ও সংস্কৃত পাঠ্য লাভের জন্য ভর্তি হলেন রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে। বাংলা ও সংস্কৃত পাঠ্যলাভের পাশাপাশি সাধারনত গৃহীত না হওয়া হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যেমন – বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ সম্পর্কে তিনি পাঠ্যলাভ করতেন। মাতা প্রভাবতী দেবীর কাছ থেকে তিনি হিন্দু দেবী দুর্গা-কালীর উপাসনা এবং আরাধনা করা শেখেন। তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্য থেকে গল্প পড়া এবং বাংলা ভক্তিগীতি শুনতেন।

বাঙালী সভ্যতার সকল ব্যক্তি না হলেও কিছু মানুষ আজীবন মানুষের সাহায্যের জন্য তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে গেছেন। সুভাষচন্দ্রও তাঁদের মধ্যে একজন সেই মহাপুরুষ। মায়ের কাছ থেকে তিনি এই স্নেহশীল স্বভাব লাভ করেন। দুর্দশাগ্রস্ত, রুগি মানুষদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বহুবার। প্রতিবেশী ছেলেদের সাথে স্নেহশীলতায় মগ্ন হয়ে খেলাধুলা ও উদ্যানচর্চা পছন্দ করতেন তিনি।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু, একজন খাঁটি বাঙালী এবং একজন প্রকৃত ভারতীয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দু হলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালনায় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবধারায় সকল ধর্মাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কিশোরবেলা থেকেই স্বামী বিবেকানন্দর ভাবাদর্শ হওয়ায় তিনি সেই কিশোর বয়স থেকেই ধ্যান অতিবাহিত করতেন। বলা যেতে পারে সুভাষচন্দ্রের কাছে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা অথবা আদি শঙ্করাচার্যের ব্যখ্যা করা বেদান্ত। কুসংস্কার থেকে কুস্বপ্ন মুক্তি করতেও তিনি এই বেদান্তের সাহায্য নিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন বড়োই খাদ্যপ্রিয় এক ব্যক্তি। এক কথায় খাঁটি ভোজন রসিক বাঙালী। ডাল, ভাত, খিচুড়ি, দই, মিষ্টি, মাছ, ভাতেভাত, চপ ইত্যাদি সবই ওনার প্রিয় খাদ্যতালিকায় পরে। বোধগম্য হয় যে এই সমস্ত খাবার কোন ব্যক্তির প্রিয় খাদ্যতালিকায় থাকলে, সে যে শিরায় গড়ে ওঠা নির্মিত খাঁটি বাঙালী তার কোনরকম সন্দেহ নেই। যদিও তাঁকে মাছে-ভাতে বললেও অপরাধ হবে না। ইলিশ

মাছ যে ছিল তাঁর অত্যন্তই প্রিয়। আমরা সকলেই জানি যে জীবনের পরবর্তী সময় এসে সমস্ত আমিশ খাদ্য ত্যগ করেন শুধুমাত্র মাছ ছাড়া। মাতা প্রভাবতী দেবীকে তিনি লেখেন: "A month ago I gave up all non-vegetarian food except fish. Nadada forced me some meat. I want to be Veg because our sages have said that non-violence is a great virtue."

শুধুমাত্র বাঙালী বলে সম্বোধন করা তাঁকে ঠিক হবে না। কারন তিনি একজন বাঙালী নন, একজন প্রকৃত ভারত-সন্তান হয়ে আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাই শুধু বাংলার বীর সন্তান নয়, গোটা ভারতবর্ষের বীর সন্তান হলেন বীর নেতা সুভাষচন্দ্র বসু।

Aye, Captain!!

Somoshree Palit

Up from the realms of a sunken past,
Down to where gorge is through,
To remain the last yet given the last –
To bid the world, a soft adieu.
A roar as true as a lion in den,
Comeback, O captain.... My captain.

Your golden voice is what we wanna hear,
Your piercing eyes – a flash at night,
The suckling babes overcame all fear,
They sold the flag for want of might.
A rage as deep as the sea is lain,
Comeback, O captain.... My captain.

When for the sake of blood, all martyrs died,
And sunk to the ground with an elegant smile –
Whose forgotten names in tears confide:
"Let me die in your arms a while."
On the way of love where loss is gain,
Comeback, O captain.... My captain.

On the virtuous lie if truth attain,
If whoever wins, the loss be mine,
If o'er and o'er – and o'er again,
I lose the way, and have got to decline –
I'll breathe a life on ye lifeless swain,
I'll bring you back.... My captain.

অন্তর্ধান ও অমরত্ব

ANNWAYA SARKAR

জন্ম মৃত্যু হলো মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। জন্মালে মরিতে হবে অমর কে কোথা রবে? কিন্তু দেবতার মৃত্যু হয়না। মানুষ রূপে জন্ম নিলেও ঠিক এইরকম মৃত্যুহীন এক ঈশ্বর হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আমরা সবাই জানি ১৯৪৫ সালের ১৮ ই আগস্ট তার চির অন্তর্ধানের কথা। কিন্তু অনেকেই মনে করেন ওইদিন নেতাজীর মৃত্যু হয়নি, অনেকে এও মনে করেন তিনি আজও জীবিত! নেতাজী এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যার শুধু জন্মতারিখ টাই আমরা জানি, মৃত্যুর তারিখ টা নয়। অন্তর্ধানের পর নেতাজী সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে চির অমর হয়ে রয়েছেন।

আজ অব্দি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান নিয়ে প্রায় ২২-২৩ টা theory পাওয়া যায়। যদিও উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণের অভাবে তার বেশিরভাগ ই নাকচ করাই যায়।এর মধ্যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনটি থিওরি। ১: তিনি বিমান দুর্ঘটনা তেই মারা যান তাইহকু বিমানবন্দরে। ২: তিনি রাশিয়া পালিয়ে যান ও সেখানেই তাকে খুন করা হয়। ৩: তিনি ভারতে ফিরে আসেন ও উত্তর প্রদেশের ফাইজাবাদ এসে আশ্রয় নেন। এছাড়াও আরো অনেক থিওরি আছে।কেউ বলেন আজাদ হিন্দ সরকার এর সোনা ও টাকা এর লোভে তাকে খুন করা হয়।কেউ বলেন তিনি ঐ তথাকথিত প্লেন ক্র্যাশ এর পর রাশিয়া না গিয়ে ওখানেই থেকে যান।অনেকে বলেন কোচবিহারের সৌলমারি আশ্রমের সাধুবাবা ছিলেন নেতাজি। যদিও এর সপক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ খুব একটা পাওয়া যায় না। তাই প্রধান ৩ টি থিওরিই আলোচিত হয়।

(১) বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু

১৯৪৫ সালের ১৮ ই আগস্ট তাইহোকু বিমানবন্দরে দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।প্রথমে এই নিয়ে সেভাবে কোনো রহস্য থাকে না।পরবর্তীকালে এক মার্কিন সাংবাদিক পণ্ডিত নেহেরুর সম্মেলনে বলেন,তার কাছে খবর আছে নেতাজী কে সাইবেরিয়ায় দেখা গেছে। এমনকি গান্ধীজি ও বিশ্বাস করতেন না সুভাষ মারা গিয়েছে।তিনি এমনকি নেতাজীর দাদা শরৎ চন্দ্র বসু কে চিঠিতে লিখেছিলেন সুভাষের শ্রাদ্ধ যেনো না করা হয়।যদিও প্রথম দুটি কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী বিমান দুর্ঘটনা তেই তার মৃত্যু হয়।এই থিওরির যথেষ্ঠ ফাঁকফোকর আছে।

যদিও ইতিহাসের পাতায় আমরা এটাই পড়ে এসেছিলাম বিমান দুর্ঘটনা তেই নেতাজীর মৃত্যু হয়। এমনকি শাহনাওয়াজ কমিশন ও খোসলা কমিশন রিপোর্ট ও সেটাই বলে।কিন্তু সব হিসেব পাল্টে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট এর নির্দেশে গঠিত মুখার্জী কমিশন এর রিপোর্ট।যাতে জাস্টিস

মনোজ কুমার মুখার্জী প্লেন ক্র্যাশ থিওরি কে নাকচ করেন।

এখন মনে করা হয় তিনি টাইহোকু বিমানবন্দর থেকে টোকিও যাচ্ছিলেন।কিন্তু না,তিনি যাচ্ছিলেন রাশিয়া।কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন,তিনি রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবেন। এখন প্রশ্ন হলো,তিনি কেনো শুধুমাত্র হাবিবুর রহমান কে সঙ্গে নিয়ে একটা জাপানি বোমারু বিমানে চড়ে বসলেন যেখানে আই এন এ এর নিজস্ব 12 সিটার বিমান তৈরি ছিল? কোথায় প্লেন ক্র্যাশ হয় সেই নিয়েও অনেক দ্বিমত।কেউ বলে এরোড্রম এর ভিতরে, কেউ বলে এরোড্রমএর বাইরে কিন্তু রান ওয়ে এর মধ্যে,কেউ বলে রান ওয়ে এর বাইরে। অনেকে বলেন ক্রাশের পর নেতাজী আগে বেরিয়ে আসেন,অনেকে বলেন হাবিবুর। কেউ বলেন হাবিবুর নেতাজী কে বের করে আনেন। এমনকি জাপানি ডক্টর টিওসিমি প্রথম দুটি কমিশন অর্থাৎ শাহনাওয়াজ কমিশন ও খোসলা কমিশন কে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেন।প্রথমে বলেন নেতাজীর হৃদয় পুড়ে গিয়েছিল, পরে বলেন যায় নি। একবার বলেন তার ৪০০ সিসি ব্লাড ট্রান্সফিউশন এর দরকার হয়,পরে বলেন হয় না।

শেষ মেষ তাইওয়ান সরকারের অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুযায়ী ওইদিন কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি,এমনকি সারা আগস্ট মাসেই কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি। যদিও এর উত্তরে অনেকে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন টালমাটাল পরিস্থিতির কারণে রেকর্ড রাখা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ১৯৪৪ এও তো যুদ্ধ চলছিল, তাহলে সেই সময়ের বিমান দুর্ঘটনা এর রেকর্ড রইলো কি করে। এমনকি হাসপাতাল, ক্রেমাটরিয়াম, ফায়ার ব্রিগেড কোনো দপ্তর থেকে ই এমন কোনো সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যায় না যা থেকে বলা যায় বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল। একমাত্র একটাই ক্রিমেশন পারমিট পাওয়া যায় একটা মাত্র ডেথ সার্টিফিকেট এর ওপর ভিত্তি করে,যেটা ছিল ইচিও ওকুরা নামে এক জাপানি ভদ্রলোকের। অবশ্য নেতাজীর সঙ্গে একই বিমানে থাকা জেনারেল শিদেই বা অন্যান্য সহযাত্রী দের ক্ষেত্রে এটুকু প্রমাণ ও পাওয়া যায় না। বলা হয় প্লেন ক্র্যাশ তে তিনিও মারা যান।তাহলে তার মৃতদেহ কিভাবে কর্পূরের মত উবে গেল? শোনা যায়, হাবিবুর রহমান নেতাজীর মৃতদেহের মুখের দিকের কোনো ছবি তুলতে দেন নি, কারণ তিনি চাননি নেতাজী কে দেশবাসী এই অবস্থায় দেখুক। বলা হয় জাপানের রেনকোজী মন্দিরে রাখা আছে নেতাজীর দেহাবশেষ। যদিও মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ দেহাবশেষ নেতাজীর নয়।

(২) রাশিয়া তে মৃত্যু

অনেকেই মনে করেন, ঐ বিমান দুর্ঘটনা ছিল সাজানো ও পরিকল্পিত। এর পর তিনি মঞ্চুরিয়া এর পথ হয়ে রাশিয়া পালিয়ে যান। সেখানেই বন্দী হন সাইবেরিয়ার এক জেলে।সেখানেই তাকে টর্চার ও খুন করা হয়।যদিও রাশিয়া সরকার এই তথ্য পুরোপুরি নাকচ করে জানিয়েছে,তাদের হাতে নেতাজী সংক্রান্ত কোনো ফাইল নেই।অনেকে বলেন পণ্ডিত নেহেরুর উস্কানিতে স্টালিন নেতাজী কে খুন করেন রাশিয়ায়।ব্যাপার টা মোটেই যুক্তিপূর্ণ নয়,কারণ নেহেরুর সঙ্গে স্ট্যালিনের সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না।

(৩) গুমনামি বাবা

বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক অনুজ ধর, চন্দ্রচূড় ঘোষ, এছাড়াও আরো অনেক বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক এটাই মনে করেন নেতাজী রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসে ভারতেই ওঠেন, উত্তরপ্রদেশের ফাইজাবাদে। সেখানেই বাকি জীবন টা কাটান। ১৯৮৫ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর তার দেহাবসান হয়।এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে,তিনি কেনো আত্মগোপন করে রইলেন? কেনো সামনে এলেন না? উত্তরে অনেকে বলেন, ওনার সাইকোলজিক্যাল ট্রমা হয়ে গেছিলো, সাইবেরিয়ার জেলে থাকাকালীন নিরন্তর অত্যাচার সহ্য করার ফলে। এখন ট্রমা মানে কিন্তু এই নয় যে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, এটা হলো সত্মার পরিবর্তন। এছাড়াও তিনি বিশ্বাস করতেন,মিত্রশক্তির যুদ্ধাপরাধী তালিকায় তার নাম ছিল।তাই তিনি বাইরে এলে ভারত সরকার বাধ্য হতো তাকে মিত্রশক্তির হাতে তুলে দিতে। এর ফলে সারা দেশে দারুন এক আচলবস্থার সৃষ্টি হতে পারত। ১৯৭১ সালে ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের নতুন যুদ্ধাপরাধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে,কেনো? ১৯৭১ সালে ভারতের কোন যুদ্ধাপরাধী জীবিত ছিল?

প্রশ্ন ওঠে, তিনি রাশিয়া থেকে পালিয়ে উত্তরপ্রদেশ কিভাবে এলেন? প্রশ্নটা খুব ই বাস্তব। কিন্তু তিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষ,তাই তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। মহানিষ্ক্রমনের সময়েও ইংরেজরা তাকে কড়া নজরবন্দী করে রেখেছিল।তবুও কিন্তু তিনি দেশ ছেড়ে পালাতে সক্ষম হন।

এখন যে সমস্ত মানুষ রা বিশ্বাস করতেন উনি ই নেতাজী ছিলেন,সেই তালিকা ও খুব দীর্ঘ। সেই তালিকায় রয়েছেন নেতাজীর অনেক পুরোনো সতীর্থ কমরেড রা। যেমন লীলা

রায়, সমর গুহ, সুনীল কৃষ্ণ গুপ্ত, অতুল সেন, পবিত্র মোহন রায়। ভগবান জীর মৃত্যুর পর তার ঘর থেকে অসংখ্য চিঠি পাওয়া যায়, যেগুলি তিনি লিখেছিলেন লীলা রায়,পবিত্র মোহন রায় দের। এনারাও ভগবানজীকে অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন, যেখানে তারা পরোক্ষভাবে ওনাকে নেতাজী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সুনীল কৃষ্ণ গুপ্ত এর পরিবারের সদস্যরা প্রায় সবাই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিখ্যাত বিনয় বাদল দিনেশ ত্রয়ীর দিনেশ গুপ্ত ছিলেন তার ভাই। এখন এরকম একজন ব্যাক্তি, যার নেতাজীর সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল, তিনি নেতাজীকে চিনতে ভুল করবেন, এমনটা হওয়া কঠিন।

এছাড়াও তার ঘর থেকে বহু জিনিস পাওয়া যায়,বাংলা ও ইংরেজীতে লেখা অসংখ্য বই, যেগুলো কোনো সাধারণ সাধুবাবা কেনো পড়বেন সেটা এক রহস্যের ব্যাপার। এছাড়াও পাওয়া যায় জাপানিজ ফিল্টার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্ল্যাশ লাইট, বাইনোকুলার ইত্যাদি। পাওয়া যায় নেতাজীর পিতা মাতা এর ছবিও। যদিও মুখার্জী কমিশন শেষে বলে, উপযুক্ত ও অকাট্য প্রমাণ এর অভাবে এটা বলা যায় না যে উনি নেতাজী ছিলেন।

নেতাজী হলো এক আদর্শ, এক শক্তি, যার শুধু জন্মই হয়, মৃত্যু নয়। তাই তিনি চিরকাল আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ে অমর হয়েই থাকবেন।

(সমাপ্ত)

ভাঙা কাঁচের জানালা

পত্রলেখা কর্মকার

ঝরে গেছে কত রক্ত,
রয়ে গেল সেই চিহ্ন;
বয়ে গেছে প্রবল হাওয়া,
থেকে গেলে তুমি স্বাক্ষী।
সেই ফাঁক দিয়ে বাড়ালে তোমার হাত,
তাকিয়ে রইলে দু-চোখ ভরে;
কখনো সূর্যের আলো হয়ে,
আবার কখনো মেঘলা দিনের বৃষ্টি হয়ে।
কত স্মৃতি, কত গল্প, কত ভালোবাসা,
আগলে রেখেছি কিন্তু ভাঙেনি প্রত্যাশা;
ভাঙা কাঁচের জানালায়, ছিলে তুমি চিরকাল,
ভালোবাসার পাখি হয়ে, ফিরে এসো অনন্তকাল।

THE TALE OF BLOOD

অগ্নিযুগের ব্রহ্মা : নিরালম্ব স্বামী (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ARNAB BANERJEE

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী শ্রী ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত একবার বর্ধমানের এক ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন "তোমরা নেতা খুঁজে বেড়াচ্ছ কোথায়? বিপ্লবের বড়দা বসে আছেন চান্নায়। যাও তাঁর কাছে।"

বিপ্লবী ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের বলা 'বড়দা' কে ছিলেন? কি ছিল তাঁর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান? আশা করি পাঠকের জানতে কৌতূহল হচ্ছে। আজ তাঁর কথাই বলবো। এই 'বড়দা' ওরফে 'নিরালম্ব স্বামী' ওরফে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয় 'ভারতের অগ্নিযুগের ব্রহ্মা'।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ১৯শে নভেম্বর ১৮৭৭ সালে বর্ধমানের 'চান্না' গ্রামে। তাঁর পিতা কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অবিভক্ত বাংলার খুলনা / যশোর কোর্টের পেশকার। মাতা অসম্ভাবিনী দেবী। ছেলেবেলায় গ্রামের পাঠশালাতেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন । এরপর বর্ধমানের রাজ কলেজে ভর্তি হয়ে F. A. (First Arts) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যতীন্দ্রনাথের পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁর ছেলেও তাঁরই মতো উচ্চশিক্ষালাভ করে সরকারী চাকরীতে যোগদান করুক। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা ছিল অন্যরকম। F. A. পরীক্ষায় পাশ করার পর অবসর সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস পড়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। শক্তিশালী ইংরেজ শাসকদের দেশ থেকে বিতারিত করতে সশস্ত্র সংগ্রাম যে অত্যন্ত প্রয়োজন সেকথা উপলব্ধি করতে তরুণ যতীন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না আর তাই পিতার নির্দেশ অমান্য করে বেড়িয়ে পড়লেন সেনাদলে ভর্তি হওয়ার জন্য। পরাধীন দেশে ততদিন বাংলায় দামালদের সশস্ত্র আন্দোলনের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশীর রাজারা আর বঙ্গসন্তানদের সেনাবাহিনীতে নিতে চাইছিলেন না। ঘুরতে ঘুরতে যতীন্দ্রনাথ এলেন এলাহাবাদে। এরপর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য এলাহাবাদে প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র-কন্যাদের গৃহশিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন। এই তথ্য আমরা পাই রামানন্দ বাবুরই কন্যা সীতা দেবীর "যুগান্তর সাময়িকী" (অধুনালুপ্ত) বাংলা দৈনিকে। পরবর্তীতে এই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি 'যতীন্দর উপাধ্যায়' ছদ্মনামে বরোদার মহারাজের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন।

ছেলেবেলা থেকেই যতীন্দ্রনাথ ছিলেন ডাকাবুকো এবং দুরন্ত প্রকৃতির। নিজের দুরন্ত ছেলেকে সুশীল সুবোধ করার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে এক সাধুর কাছে নিয়ে যান। ঐ সাধুবাবা নিজেকে 'অ-বন্দুকবিদ্ধ' বলে প্রচার করতেন। বালক যতীন্দ্রনাথ ঐ সাধুবাবার সত্যতা যাচাই করার জন্য লুকিয়ে পিতার পিস্তল নিয়ে ঐ সাধুবাবাকে গুলি করতে যান। বাড়ির

লোকেরা টের পেয়ে কোনরকমে পরিস্থিতি সামলে দেন।

পরবর্তীকালে বরোদার মহারাজের সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সৈনিক হিসাবে যোগদানের পরও একটি দুঃসাহসী ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়েন যতীন্দ্রনাথ। ঘটনাটি ছিল এরকম : - একদিন বরোদার মহারাজা যখন নগর পরিভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন তখন তাঁর গাড়ির একটি ঘোড়া হঠাৎ অদ্ভুত আচরণ শুরু করে এবং সহিসের হাজার চেষ্টাতেও না থেমে ছুটতে থাকে পাগলের মতো । ঐ ঘোড়ার গাড়িতে সহিস এবং স্বয়ং মহারাজা আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকেন। সেই চিৎকার শুনে যতীন্দ্রনাথ সামনে এসে দাঁড়ায় এবং প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়াটিকে থামায়। এরকম একটি দুঃসাহসী কাজে খুশি হয়ে তাঁকে নিজের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে মহারাজা নিযুক্ত করেন। তবে ঐ দামাল ঘোড়াকে থামাতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথ নিজেও গুরুতর আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মহারাজ তাঁর সেক্রেটারীকে দায়িত্ব দেন আহত যতীন্দ্রনাথের চিকিৎসায় কোন ত্রুটি যেন না হয়। মহারাজের নির্দেশে ঐ সচিব বরোদা হাসপাতালে আসেন আহত সৈনিক যতীন্দ্রনাথকে দেখতে। সেক্রেটারী মশাই আহতের কাছে এসে শুনলেন সে অস্ফুটে বলছেন, বাবা গো ... মা গো। বিস্মিত সেক্রেটারী নিজেও ছিলেন বাঙালী। তাই তিনি যতীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন – সুদূর বাংলা থেকে এসে এক বাঙালী যুবক কিভাবে ভর্তি হল বরোদার রাজকীয় বাহিনীতে?

আশা করি পাঠকদের কৌতূহল হচ্ছে এটা জানতে যে কে ছিলেন ঐ বাঙালী সচিব? ঐ বাঙালী সচিব ছিলেন মহাবিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ ঘোষ; যিনি নিজেও ইংরেজদের চাকরী যাতে না করতে হয় তার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ICS পরীক্ষায় অশ্বারোহনে ফেল করে ঐ একই সময়ে বরোদার মহারাজের কাছে চাকরি নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পরিচয় হতে অরবিন্দ শুনলেন এক অদ্ভুত কাহিনী। বাংলায় এক প্রত্যন্ত গ্রামের এই যুবক এতদূর ছুটে এসেছে শুধু একটাই কারণে। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেবেন বাঙালী যুবকদের জন্মভূমিকে উদ্ধার করবেন পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে।

বরোদাতে থাকার সময় তাঁর আলাপ হয় বাল গঙ্গাধর তিলকের সাথে। এই মহান নেতার সাথে কথা বলার পর তাঁর মনে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ আরও গাঢ় হয়। পরবর্তীকালে অরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ দুজনেই অনুভব করলেন এভাবে ভিন রাজ্যে পড়ে থাকলে লাভ হবে না। তাই একে একে দুজনেই চাকরি ছেড়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। এরপর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে অরবিন্দ ঘোষ বাংলার বুকে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথকে বাংলাতে আসার আহ্বান জানান। অরবিন্দের আহ্বানে সারা দিয়ে ১৯০০ সালে কলকাতায় এসে ১০৮ সারকুলার রোডে এক বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইস্টক্লাব'। পরবর্তীতে এই সংগঠন 'অনুশীলন সমিতির' সাথে যুক্ত হয়। ১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষের পরামর্শে যতীন্দ্রনাথ এবং অরবিন্দের ভাই শ্রী বারীন ঘোষ কলকাতায় বাগবাজারে সরলা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সেখানেই তাঁদের সাথে আলাপ হয় প্রখ্যাত ব্যারিস্টার পি. মিত্র এবং সতীশচন্দ্র বসুর সাথে।

এরপর ১৯০২ সালের ২৪শে মার্চ (বাংলার ১০ই চৈত্র ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) সোমবার, হেদুয়ার নিকটবর্তী ২১ নং মদন মিত্র লেনে এক ছোট বারিতে সতীশচন্দ্র বসুর উদ্যোগে এবং পি. মিত্র, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় বরোদা থেকে আসা যুবক দল ও বাংলার বিপ্লবীদের নিয়ে গড়ে ওঠে অনুশীলন সমিতি নামে দুর্ধর্ষ বিপ্লবী সমিতি। বলা ভালো বিপ্লবীদের শিক্ষাকেন্দ্র। এই সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন পি. মিত্র এবং মহাসভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও অরবিন্দ ঘোষ, কোষাধক্ষ রূপে সুরেন ঠাকুর সমিতির দায়িত্ব নেন। এছাড়াও বহু নামী বিপ্লবী নেতা এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সখারাম গণেশ দেউস্কর এখানে অর্থনীতি পরাতেন, পি. মিত্র নিজে পড়াতেন ইতিহাস এবং যতীন্দ্রনাথের উপর দায়িত্ব ছিল যুবক বিপ্লবীদের শৃঙ্খলাবোধ, আধ্যাত্মবাদ ও সামরিক শিক্ষার। এখানে বিপ্লবীদের হিন্দুধর্ম শাস্ত্রপাঠ করানো হত। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এই সমিতির সদস্যরা সেদিন অচল করে দিয়েছিল ইংরেজদের প্রশাসনিক কাজকর্ম। বিপ্লবীদের দাপটে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। শোনা যায় এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্বয়ং ভগিনী নিবেদিতাও। কিছুদিন পর এর দপ্তর হয় ৪৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে। এর মধ্যে বারীন ঘোষের উদ্যোগে তাঁদের পৈত্রিক বাগানবাড়িতে তৈরী হয় একটি বোমা কারখানা। এই কারখানার সাথে হেমচন্দ্র কানুনগো, উল্লাস কর দত্তের মতো বিপ্লবীরা। সমিতি এবং এই কারখানার মধ্যে সমন্বয় রক্ষার কাজটি করতেন যতীন্দ্রনাথ। তবে দেশে ফেরার পর প্রথমেই কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কলকাতার সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহন করেন নি। প্রথমে তিনি যান নিজের গ্রামে চান্নায়। এরপর চন্দননগরে; আর এই চন্দননগরেই সুহৃদ সম্মিলনী কক্ষে গেরুয়া বসনধারী এই বিপ্লবী নেতার হাত ধরেই বিপ্লবের পথে পা রাখেন মহা বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। ১৯০৩ সালে তাঁর যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং বিদ্যাভূষণের বাড়িতেই তাঁর সাথে আলাপ

হয় ললিত চট্টোপাধ্যায় ও বাঘাযতীনের। সেই থেকে বাঘাযতীনের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালেও বাঘাযতীন বৈপ্লবিক নানা কাজে তাঁর পরামর্শ নিতেন।

১৯০৪ সালে অর্থ সংগ্রহের জন্য কয়েকজন স্বদেশীরা তারকেশ্বরে ডাকাতি করার কথা শুনে যতীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হন। তাঁর সঙ্গে আদর্শ, নীতি, শৃঙ্খলা নিয়ে সমিতির প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিরোধ গড়ে ওঠে। মানসিক আঘাত পেয়ে তিনি সমিতির কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে সমিতির বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দূর করার জন্য পাঞ্জাব এবং পশ্চিম ভারতে অনুশীলন সমিতির গুপ্ত শাখা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য পি. মিত্র যতীন্দ্রনাথকে পাঞ্জাবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। সংগঠনের ভার অরবিন্দ ঘোষের হাতে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ উত্তর ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পাঞ্জাবে আসার পর যতীন্দ্রনাথ সবার আগে দেখা করেন "কোমাগা তামারু" খ্যাত বাবা গুরুজিৎ সিং -এর সাথে। তাঁর সাথে মিলে পাঞ্জাবে 'গদর পার্টি' নামক এমন এক সংগঠন গড়ে তোলেন যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীর শিখ রেজিমেন্টের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। এখানেই তাঁদের সাথে সহকর্মী হিসেবে যোগদান করেন ভগত সিংহ -এর পিতা কিষেণ সিং। বিদ্রোহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গুরুজিৎ সিংকে নিয়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথম মশালটি জ্বালান যতীন্দ্রনাথই। কিষেণ সিং ছাড়াও একে একে দলে যোগ দেন বিপ্লবী অজিৎ সিং, লালা হরদয়াল, লালা অমরদাস, ওবেদুল্লা সিন্ধি, পেশোয়ারের ডাঃ চারু ঘোষ, অম্বালার ডাঃ হরিচরণ মুখপাধ্যায়ের মত নেতৃবৃন্দ।

১৯০৭ সালে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মা বান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে যতীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। কলকাতায় কাগজের ভার নিয়েই 'মরি নাই আমি আসিয়াছি' নামে এক জোরালো প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু 'সন্ধ্যা' পত্রিকার পরিচালকগণের এরকম গরম রাজনৈতিক প্রবন্ধ পছন্দ হলো না। ফলস্বরূপ যতীন্দ্রনাথের সাথে তাদের মতবিরোধ শুরু হয়। মতবিরোধের জেরে তিনি পত্রিকার কাজে ইতি টেনে অন্নদা কবিরাজের বাড়িতে ওঠেন। সেখানে থাকার সময়ই তাঁর সাথে আলাপ হয় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার নিখিল রায় মৌলিক, কার্তিক দত্ত, কিরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সাথে।

এরই মধ্যে ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল ঘটে যায় এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ দিন বিহারের মুজাফফরপুরে রাত সাড়ে আটটার সময় ইওরোপিয়ান ক্লাবের সামনে বোমা ছুঁড়ে তিন জন ইংরেজকে হত্যা করে ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী। এই বোমা বিস্ফোরণের পরই পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে মুরারি পুকুরের বাগানবাড়িতে বোমা কারখানার হদিস পায় ২রা মে তারিখে। পড়ে ২১শে মে ১৯০৮ তারিখে শুরু হয় ঐতিহাসিক আলিপুর বোমা মামলা। সাত চল্লিশ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয় এই মামলার অভিযুক্ত হিসাবে। নরেন গোস্বামী নামের এক বিশ্বাসঘাতক বিপ্লবীর স্বীকারোক্তিতে অভিযুক্ত করা হয় যতীন্দ্রনাথকেও। তবে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলেও কারারুদ্ধ করা হল অরবিন্দ ঘোষকে। মুক্তি পাওয়ার পর আবার অনুশীলন সমিতির নেতৃবর্গের সাথে মতানৈক্যের জেরে বিপ্লবী জীবনের সাময়িক ছেদ ঘটিয়ে তিনি হিমালয়ে চলে যান। পরে এলাহাবাদে সোহং স্বামীর সান্নিধ্য লাভের পর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দীক্ষা নেন। দীক্ষা নিয়ে তাঁর নাম হয় 'নিরালম্ব স্বামী'। যুবক বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল 'হিরন্ময়ী' নামক এক অল্প বয়স্ক বালিকার সাথে। সন্ন্যাস গ্রহণ করে বাংলায় ফিরে তিনি সবার আগে দিক্ষা দেন তাঁর স্ত্রী-কে। দীক্ষা গ্রহণের পর 'হিরন্ময়ী দেবী' -র নাম হর 'চিন্ময়ী দেবী'।

এরপর ১৯০৮ সালেই তিনি নিজের গ্রাম চান্নাতেই একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমের নাম হয় 'আশ্রম চান্না'। বিগ্রহ বিহীন সোহং দর্শনের উপড়ই প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটি তিনি আত্মানুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংযম, ধৈর্য, সাহস, সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা, ভক্তি, নিষ্ঠা, সহমর্মিতা – এই নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এই আশ্রম যেখানে যতীন্দ্রনাথ সোহ্-হং ধর্মের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন যা আজও ফল-ফুলে বিরাজিত এবং সংসারী পথক্লান্ত মানুষের শান্তির নীড় ও মুক্তির আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। বিপ্লবী জীবন ত্যাগের পরও তিনি পরক্ষভাবে বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতেন। 'খড়ি' নদীর পাড়ে চারটি থানার মাঝে জঙ্গল ঘেরা ঐ আশ্রমের একটি বটগাছের নিচেই চলত ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপ-রেখা তৈরীর গোপন বৈঠক। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন রাসবিহারী বসু, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষের মত স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, নিবন্ধ ও আশ্রমের স্মরনিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই আশ্রমে এসেছিলেন লালা লাজপত রায় থেকে শুরু করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, যদুগোপাল মুখার্জী, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, ফকির রায়, বিনয় চৌধুরী, কিষেন সিং সহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। এরকম আসা যাওয়া এখানে লেগেই থাকত। পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড বিপ্লবীরা

বহুবার নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছেন এখানে। এমনকি বিপ্লবীদের গোপনে ধরার জন্য ‘খানা জংশন’ -এর কাছে একটি পুলিশ ফাঁড়ি তৈরী করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। ইতিহাস ঘেঁটে যতদূর জানা যায় বরানগরের যোগেন্দ্র বসাক লেনের (বর্তমান বরানগর থানার বিপরীত দিকের রাস্তা) একটি বাড়িতে ১৯২৮ -এর ডিসেম্বর মাসে একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্য এসেছিলেন ভগত সিং। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল অনুশীলন সমিতির আদিপর্বের বিপ্লবী সংগঠক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করা যিনি ততদিনে রাজনীতির সংস্পর্শ ছেড়ে ‘নিরালম্ব স্বামী’ নাম নিয়ে সাধু হয়ে গেছেন। ঐ সময়ে তিনি ঐ বাড়িতেই তাঁর এক শিষ্যের কাছে ছিলেন। এই তথ্য খুব কম লোকই জানেন।

যতীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি ছিল সুসজ্জিত এবং ফুল ফলে পরিপূর্ণ। কিন্তু ১৯৭৮ এবং ১৯৯৮ সালের দুটি বন্যা এবং দীর্ঘদিন ব্যাপী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে আজ বিপ্লবীদের এই গোপন আস্তানাটি অবহেলিত এবং ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছে। আগেকার বহু ঘর-বাড়ি আগেই নষ্ট হয়ে গেলেও টিনের চাল দেওয়া বিপ্লবীদের দুটি আস্তানা এবং যতীন্দ্রনাথ, ফকির রায় প্রমুখ বিপ্লবীদের মূর্তিগুলি আজও এই গৌরবময় আশ্রমের ইতিহাসকে বহন করে চলেছে।

এই আশ্রমেই ১৯৩০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর দেহ রাখেন নিরালম্ব স্বামী ওরফে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পর আশ্রমের অধ্যক্ষ হন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তথা প্রজ্ঞান পাদজী। ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনের অধিকাংশ অধ্যায় নানা কারনে অনাদরে অবহেলায় স্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। সেইরকমই এক মহান পুরুষ হলেন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে সশস্ত্র সংগ্রামের দীক্ষাগুরু বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। এই মহামানবকে বিপ্লবী যদুগোপাল মুখার্জী ‘অগ্নিযুগের ব্রহ্মা’ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

তথ্যসূত্র: -

1. ভারতের সাধক সাধিকা (সুবোধ চক্রবর্তী)
2. ebanglalibrary.com
3. bharatpedia.org
4. Bangla Amar Pran – The glorious hub for the Bengal (September 14, 2020)
5. অনুশীলন সমিতির ইতিহাস (শ্রী জীবনতারা হালদার)

অগ্নি যুগের ব্রহ্মা
বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী

এক অজানা পাঠান

Najmin Sultana Haque Sen & Subham Sen

Najmin & Subham are Social Activists who work to change the current unjust system. As a duo, they travel and document historic places and their significance along with vivid research on forgotten topics.

'সব মানুষকেই একদিন-না একদিন মরতে হবে; কিন্তু যাঁরা দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা অমর হয়ে থাকেন। আমি জানি, তুমি যে-পথ বেছে নিয়েছ, সে-পথ থেকে ভ্রষ্ট হবে না। জাতির সুনাম তোমার হাতে কলঙ্কিত হবে না আমি নিশ্চিত জানি।'

ওপরের এই কথাগুলো এক পিতা তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী এক পুত্রকে শেষবারের মতো সম্বোধন করে বলেছিল। পিতার নাম গুরুদাস মল। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও নিজের প্রিয়তম সন্তানকে দেশমাতৃকার চরণে সঁপে দিতে একবারও ভাবেননি, এই যুগে দাঁড়িয়ে কতজন বাবা-মা একাজ করতে পারবেন এ নিয়ে যথেষ্ট দ্বিধা থাকবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে যাঁরা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সীমান্তবর্তী এলাকার জনজাতির অবদান কে আজও আমরা ব্রাত্য করে রেখেছি। ইতিহাস বইতে স্থান পায়না এদের বীরত্বের কথা। এমনই এক জনজাতি পাখতুনিস্তানের পাঠানরা।

১৯৩০ এর গোড়ার কথা। মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংকল্পে লালকুর্তা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল গুরুদাস মলের দুই ছেলে - হরিকিষন আর ভগৎরাম। লাল পোশাকে সজ্জিত হয়ে খান আব্দুল গফফর খানের নেতৃত্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পবার্তা পাখতুনিস্তানের গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পৌঁছে দিতেন তাঁরা। অজস্র মিছিল, প্রদর্শনী ও সভা-সমিতি থেকে শাসক সম্প্রদায়ের উপর নির্দেশ যেত - 'চলে যাও'! এ্রী জাবাবে শাসক-সম্প্রদায় সহিংস শক্তির আশ্রয় নিত। পেশোয়ার ও অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র পাখতুনদের উপরে গুলিবর্ষণ করা হল, শত শত বীর মৃত্যুবরণ করল, সহস্রাধিক চলে গেল কারার অন্তরালে।

এভাবেই একদিন জেলবন্দী হল হরিকিষণ আর ভগৎরাম। নিজের দেশের মাটিতেই বন্দী হতে হল পেশোয়ার সেন্ট্রাল জেলে। ইংরেজি ভালো না জানার দরুন সরকারের লেখা চুক্তিপত্রে ভুল করে সই করে মুক্তি পেল হরিকিষণ। গুরুদাস মল এই সংবাদ জানতে পেরে হরিকিষাণ কে তিরস্কার করলেন। হরিকিষণ পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে তাকে দিয়ে কৌশলে সই করানো হয়েছে। কিন্তু পিতা তাকেই অপরাধী মনে করলেন।

পিতার তিরস্কারে হরিকিষণ গভীর আঘাত পেল মনে। তাঁর জীবনে একটা পরিবর্তন সূচীত হল এখানেই। সে স্থির করল অনিচ্ছায় হলেও সে যা করেছে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। এই প্রায়শ্চিত্ত হল দেশের মুক্তির জন্য চরম ত্যাগ। হরিকিষণ সিদ্ধান্ত নিল পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার জিওফ্রি দ্য মন্টমোরেন্সিকে গুলি করে মারতে হবে। এই কাজের আগে হরিকিষণ পিতার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। গুরুদাস মল বুঝতে পারলেন নিশ্চিত মৃত্যুও লক্ষ্য থেকে তাকে টলাতে পারবেনা। ১৯৩০ এর ১৯ শে ডিসেম্বর নৌসেরা রেল স্টেশনে শেষ বারের মতো নিজের দেশপ্রেমিক পুত্র কে আলিঙ্গন করলেন গুরুদাস মল। পিতা পুত্রকে নয় - বরং এক দেশপ্রেমিক আর এক দেশপ্রেমিককে আলিঙ্গন

করলেন। হাত তুলে যখন গুরুদাস মল তাঁর তরুণ পুত্রকে বিদায় সম্ভাষন জানালেন তখন তাঁর দুই চোখ অশ্রুসিক্ত, তিনি জানতেন এই তাঁর ছেলের সাথে শেষ দেখা।

১৯৩০ এর ২৩ শে ডিসেম্বর লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নরের উপরে গুলি চালালেন হরিকিষণ।

বিচারে হরিকিষণের ফাঁসি হয়। হরিকিষণ তার বিবৃতি তে বলেছিল "ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে আমার কোনো বিদ্বেষ ভাব নেই, কিন্তু শাসকতন্ত্রের দৌলতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশী এসে তাদের শৃংখলে আবদ্ধ রেখে সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের উপরে শোষন চালিয়ে যাচ্ছিল। তাকেই আমি চূর্ণ করতে চেয়েছিলাম। আমার ভাগ্যে কি আছে আমি জানি,সেই সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই। আমার জীবন বিসর্জনের ফলে যদি ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্য অধিকতর নিকটবর্তী হয় তাহলে একবার মাত্র আমি জীবনদান করব না,বার বার জন্ম নিয়ে হাজার বার তা করব। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমার মৃত্যুর পর হাজার হাজার হরিকিষণের জন্ম হবে। তারাই স্বাধীনতার সংগ্রাম কে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। "

ফাঁসির আগে পিতার সাথে শেষ সাক্ষাৎকারে হরিকিষণ তাঁর পিতা কে বলেছিল "আমি গীতার শিক্ষায় বিশ্বাস করি, আত্মার অমরত্বেও আমি বিশ্বাসী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ হল পুরোনো পথ ছেড়ে নতুন পথে চলা। আমি আবার জন্ম নেব,যা করে গেলাম তাই আবার করব। এইভাবে জন্ম মৃত্যুর চাকা ঘুরতে থাকবে যে পর্যন্ত না দেশ স্বাধীন হয়।"

Harikishan Talwar

আমাদের দেশের কংগ্রেস-নির্ভর অহিংসের স্তাবক ইতিহাসবিদ দের লেখাতে স্থান পায়নি এঁদের ইতিহাস। ফুটনোটেও স্থান পায়নি তলোয়ার পরিবারের ইতিহাস। হরিকিষণ তলোয়ারের ভাই ভগৎরাম তলোয়ার নেতাজীর সঙ্গী হয়েছিলেন পেশোয়ার থেকে কাবুল হয়ে রুশের পথে, সেই অজানা ইতিহাসের গল্প না-হয় আরেকদিন শোনাবো।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ঘাল্লা দেওরের এই তলোয়ার পরিবার। বিপ্লবী চমনলাল আজাদ পিতাপুত্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন - "সম্ভবত ইতিহাসে এইটিই প্রথম দৃষ্টান্ত যেখানে পিতা তাঁর পুত্রকে বিপ্লবের পথে দীক্ষা দিয়েছেন, আর সেই তরুণ পুত্রকে দেশের স্বাধীনতার জন্যই ফাঁসির মঞ্চে তুলে দিয়েছেন।"

उत्तर प्रदेश के अयोध्या, बस्ती, नीमसर, लखनऊ, इत्यादि के भग्नावशेषों में गुमनामी में रहकर। तो कभी फूल, पत्ते और राख खाकर जिस छोटे खुदा रुपी नेताजी ने आपको इंफाल का युद्ध करवा कर स्वतंत्रता दिलवाई है।

जिन्होंने सन '65 और '71 का युद्ध जितवाते हुए हमारी जननी जन्मभूमि को एकत्रित करने का भरसक प्रयास किया है।

जिनके राजनयिक संबंध चीन के माओ ,तिब्बत के दलाई लामा, अमेरिका के कई मंत्री ,वियतनाम के हो ची मिन्ह ,रूस के स्टालिन ,आयरलैंड के प्रधानमंत्री ,जर्मनी के हिटलर ,इत्यादि से थे।

व अपने ही देश के नेहरु जी, इंदिरा जी ,चरण सिंह जी, प्रणब दा ,ठाकरे जी, वाजपई जी ,गोलवालकर जी , भागवत साहब ,मोदीजी, आडवाणी जी, इत्यादि से थे। जिनका अंतिम संस्कार गुप्तार घाट ,सरयू नदी के किनारे हुआ ,जहां भगवान श्रीराम ने अपना देह त्यागा था।

जागो मोहन प्यारे इस बार उन्हें अभासी यानी वर्चुअल श्रद्धांजलि देने का निमंत्रण सीधा रामकथा संग्रहालय, अयोध्या से है।

~ Samyak Jain

THE OBLIVIOUS FIGURES OF THE INDIAN FREEDOM STRUGGLE

SHOURJYO GHOSHAL - EPISODE 1

Of the innumerable revolutionaries of the Indian freedom struggle only a few had the privilege of reflecting itself in pages of history books. However, some anonymous figures with their utmost contribution to the struggle haven't secured a tenured place in the pages of antiquity. In regards to above mentioned title, in each episode we'll be shedding light on life story of some unsung revolutionaries of the Indian Freedom Struggle.

In this inaugural episode we'll be recalling the life and times of Revolutionary Anathbandu Panja.

Anathbandu was born in the year 1911 at Jalabindu district in Midnapore. His father was Surendranath Panja. Anathbandu was a student of Midnapore Town School. He was one of the confidential members of the Bengal Volunteers. Along with Mrigendra Nath, Nirmal Jeevan Ghosh, Braja Kishore Chakraborty and Ramkrishna Roy, Anathbandu travelled to Kolkata to acquire the knowledge of operating Revolver. At the end of the training Panja returned to Midnapore with 5 Revolver. At that a time Mr. Bernard E J Burge a ruthless district magistrate have started unutterable torture over the revolutionaries and later the above mentioned revolutionaries were alleged of killing the District Magistrate.

At the morn of 2nd of September, 1933 the District Magistrate was about to play for Midnapore Club against the Mohamedan Sporting Club at the Midnapore College Ground. Revolutionaries Anathbandu and Mrigendra Nath Dutta with an attempt to enter the ground by pretence of practicing football, killed the fair skinned torturer "Burge". In the while the other revolutionaries suceeded in escaping. However Anathbandu Panja was shot dead at the spot. Among the other revolutionaries, some were exiled while some were hanged and the rest were punished with life time imprisonment.
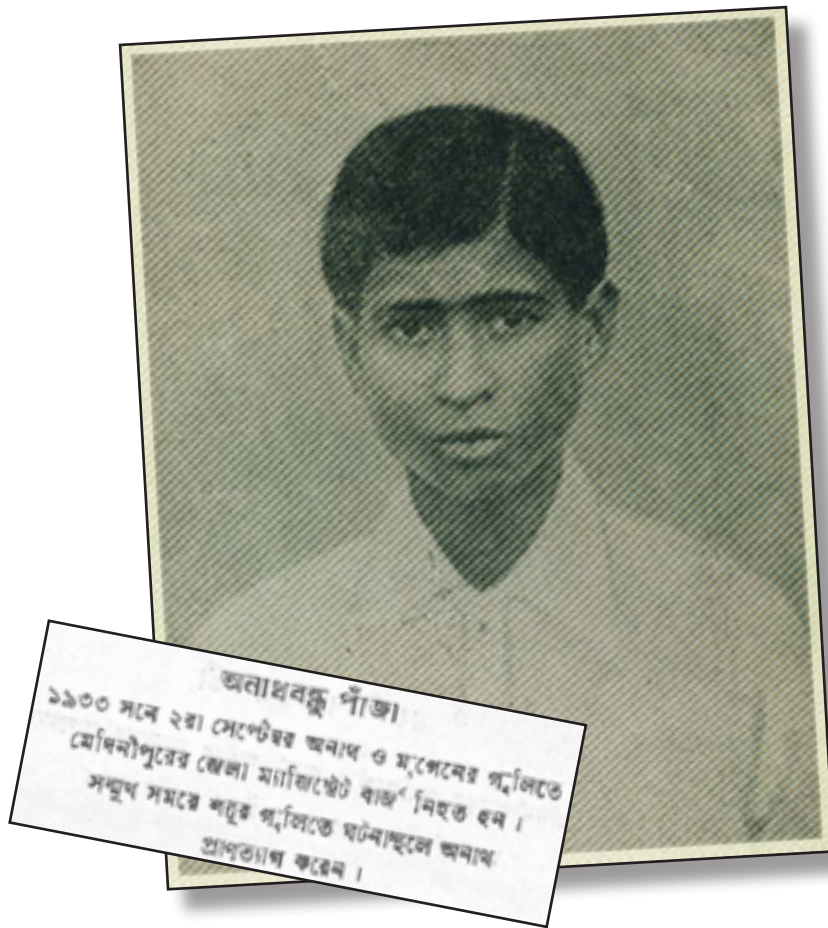
Ananthbandhu Panja, along with Ramkrishna Roy, Brajakishore Chakraborty, Nirmal Jiban Ghosh and Mrigen Dutt planned to shot him dead while Burge was playing a football match (Bradley-Birt football tournament) named by Francis Bradley Bradley-Birt at the police grounds of Midnapore. Burge, during the half time of the football match in Police parade ground was killed on 2 September 1933 by them. Anathbandhu was killed instantly by the body guard of the DM and Mrigen Dutta died in the hospital on the next day. Anathbandhu Panja, Mrigen Dutta and the other persons were acquitted on murder charge of the district magistrate of Midnapore

Tombstone of
Bernard E J Burge (Bobby)
District Magistrate, Midnapore

HOME - DEPT
1934
Pollitical
No. 45/18/34-Poll
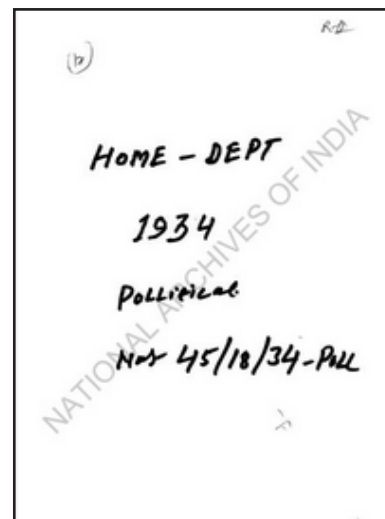
Judgments Delivered in the Case of
Bernard E J Burge(Bobby)
District Magistrate, Midnapore
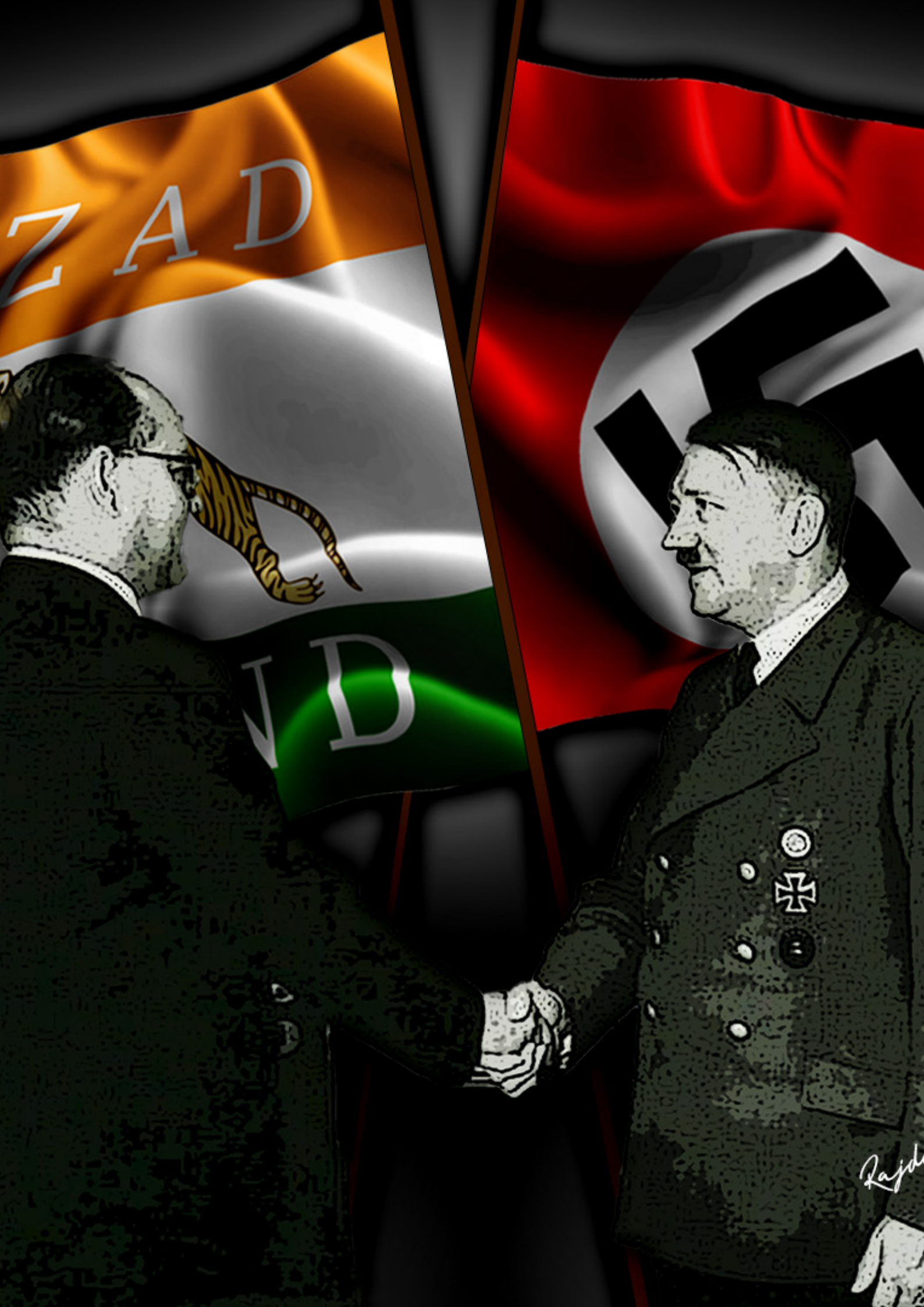
क्रांति

VIKRAM BANSAL

क्रांति, भारत की संकीर्ण मानसिकता के बीच एक शब्द ने अपने अर्थ को खोकर एक ऐसा पहचान पा लिया है जिसे सुनकर लोगों के हृदय में खौफ उत्पन्न होने लगता है |

जिस देश को आजादी बिना कोई खड़क और डाल चलाएं ,बिना किसी संघर्ष के मिली है तो वहां क्रांति शब्द से मनो में खौफ पैदा होना लाजमी है। सैकड़ों साल पुरानी जर्जर और रद्दी हो चुकी मेकॉले शिक्षा पद्धति में हमारे देश के क्रांतिकारियों को सदैव एक आतंकवादी के रूप में दर्शाया गया है जिससे हमारे देश में यह धारणा बैठ गयी है कि क्रांती का मतलब केवल और केवल हिंसा है।

यहां के लोग क्रांति का मतलब खून-खराबा, बम विस्फोट और हत्याएं ही मानते हैं तो क्या क्रांति का रास्ता मासूमों के खून से सने बारूदी ढेरों पर बना है ? जब मैं यह लिख लिख रहा हूं उस वक्त दुनिया की चौथे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स जिसने कंप्यूटर जगत में क्रांति लाई, जैफ बेजॉस जिन्होंने ई-कॉमर्स की दुनिया में इतिहास रचा और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क जिनकी बनाई हुई प्रत्येक कंपनियां दुनिया बदलने का काम कर रही है, इनमें से कितने लोगों ने हत्याएं की है? कितने देशों को अपने बमों के धमाकों से दहल आया है? कितने मासूमों का खून अपने खंजर से बहाया है? क्रांति के लिए खून-खराबा ,बम विस्फोट और गोली बंदूकों की जरूरत नहीं होती, क्रांति का मतलब है बदलाव, वह बदलाव जो दुनिया में अब तक नहीं हुआ और ना ही दुनिया ने कभी वह बदलाव देखा है, एक ऐसा बदलाव जो दुनिया बदलने की क्षमता रखती है।

कभी भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था मगर आज भारत एशिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है आज हमारे देश में 54 मिलीयन लोग बेरोजगार हैं, हमारे देश में 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं और उन 7000 लोगों का तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा जो रोज भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान गवा देते हैं।

हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है और हाथों में झंडा लेकर सड़क पर जुलूस निकालने या फिर लाल किले पर धरना देने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारी चीख़ों को या तो अनसुना

कर दिया जाएगा या फिर दबा दिया जाएगा। इन समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए हमारे देश को जरूरत है औद्योगिक क्रांति की, हमारे देश में औद्योगिकरण जितना पांव पसारेगा उतना ज्यादा लोगों को यहां रोजगार मिलेगा जिससे हमारे देश में गरीबी तेजी से घटेगी और औद्योगीकरण के कारण एक बंजर से जगह पर भी कल को एक खूबसूरत शहर बस सकता है।

मगर दूसरी और ऐसे औद्योगीकरण से हमारे देश को क्या फायदा होगा जब हमारे मालिक कोई विदेशी हो हमारे भारत के लोगों का पैसा भारत से बाहर जाकर दूसरे देशों को समृद्ध बनाने में अपना योगदान निभाए और हम भारतीय बस उन विदेशियों के पीछे अपना दुम हिलाते रहे। अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई तकनीक इजात हो गई है तो संभव है की 5 या 10 सालों में वह भारत में भी आ ही जाएगा , अगर हमारे देश को कंज्यूमर के बजाय क्रिएटर बनना है तो हमें दुनिया से आगे सोचने की आदत डालनी होगी। अगर हमारा देश उन्हीं चीजों का उद्योग भारत में डालता रह गया जिसे किसी अन्य देश ने बनाया है तो हम कल भी थर्ड क्लास कंट्री थे और कल भी वहीं रह जाएंगे। हमारे देश को जरूरत है एंटरप्रेन्योर्स की, नए आइडिया की और नई सोच की।

मगर हमारे देश के लोग सैकड़ों साल पुरानी रद्दी और जर्जर हो चुकी शिक्षा पद्धति पर एक नए देश के निर्माण का सपना देख रहे हैं ,हमारा भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इंजिनियर्स प्रोड्यूस करने वाला देश है मगर हमारे 80% इंजीनियर्स बेरोजगार है कंपनियां उन्हें नौकरी देने के काबिल नहीं समझती है, हमारे देश में युवाओं को कल का भविष्य माना जाता है मगर हमारे देश में हर घंटे एक स्टूडेंट खुदखुशी करता है, जो शिक्षा पद्धति हमारे भविष्य को ही कुचल रहा है उसके बल पर हम सुनहरे भारत का सपना कैसे देख सकते हैं? हमेंऐसेरद्दीऔरजर्जरशिक्षापद्धतिकोबदलकरअपनी एक नई शिक्षा पद्धति स्थापित करने की आवश्यकता है जो हमें नौकर नहीं बल्कि मालिक बनाना सिखाएं हमें कुछ नया और इनोवेटिव करना सीखाए जो भारत का भविष्य बदलने में एक अहम भूमिका निभाएं। भविष्य में इसी शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण कर हमारे देश के ईमानदार एवं जिम्मेदार युवा राजनीति, कानून व्यवस्था और मीडिया जैसे अन्य विभागों में सम्मिलित होकर देश को एक बेहतर भविष्य देने में अहम भूमिका अदा करेंगे।

अगर कोई व्यक्ति देश परिवर्तन का सोच लेकर अपनी एक राजनीतिक पार्टी का गठन करता है तो उसे भव्य रुप लेने में और अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने में बहुत समय लगेगा मगर वहीं राजनीतिक पार्टी कोई ऐसे उद्योगपति से हाथ मिला ले जो देश को वास्तव में बदलना चाहता है तो यह समस्या का समाधान हो सकता है राजनीतिक पार्टी उद्योगपति को उसकी कंपनी के लिए मेन पावर उपलब्ध कराएं तो राजनीतिक पार्टी का एक वर्चस्व स्थापित होगा और उसके दिए मैन पावर से कंपनी भी आगे बढ़ेगी। कंपनी अगर कोई सामाजिक कार्य करता है तो उसमें उसे उस राजनीतिक पार्टी को भी सम्मिलित करना चाहिए जिससे दोनों का फायदा होगा और दोनों तेजी से ऊंचाइयों को छूएंगे। लिखने के लिए अभी बहुत कुछ है हमारे देश का मीडिया, किसान ,मजदूर, सैनिक ,बहुत कुछ मगर सर्वप्रथम कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने हृदय से इस देश को परिवर्तन करने का जज्बा रखता हो। 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी सहते हुए शायद आज की पीढ़ी को अन्याय और गलत सहने की आदत हो गई , मुर्दों के द्वारा क्रांति नहीं आती क्रांति के लिए आपको और हमें उठना होगा । हमारे देश के लाखों क्रांतिकारियों ने भारत को आजाद कराने के लिए गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी मगर आज भारत में काले अंग्रेज अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं ।

सुभाष चंद्र बोस ,भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल ,रासबिहारी बोस,खुदीराम बोस,सूर्य सेन जैसे महान क्रांतिकारियों ने इतना संघर्ष क्या केवल भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए किया था? नहीं, शायद वे आज अगर इस भारत में जिंदा होते तो उनका भी यही सोचना होता की उनकी कुर्बानी व्यर्थ हो गई है। हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने कहा था कि अगर एक भगत सिंह फांसी के फंदे को चुनता है तो हजारों भगत सिंह इस देश के लिए पैदा हो जाएंगे और आज हमें जरूरत है बस वो भगत सिंह खुद में ढूंढने की।

SARASWATI: YOUNGEST SPY OF INDIA

Kankana Ghosh

Kankana Ghosh is a professor of Mass communication and Journalism at Swami Vivekananda University. She is an avid Netaji admirer and conducts research on his works.

One of the bravest stories usually starts when a person is able to live his or her dream. The courage starts to show to the world if the person is fully devoted, determined and dedicated. The story of Mani Raman is about courage and bravery and devotion towards our motherland, Bharatbarsha.

The little girl lived in Burma (now Myanmar). She was one of the youngest spies of Bharatbarsha. The little girl started to live her dream as she had a desire to join the Indian National Army. When she was only 12 years old, she and her friend met Netaji Subhas Chandra Bose in Rangoon. At that time, showing her courage, she requested Netaji to allow her to join the Indian National Army.

However, Netaji could not allow her to join the army as a soldier because she was only a 12 years old girl. The story has turned into a new way when Netaji told her to join the INA as a nurse so that she could take care of all soldiers. One day she saw a member of INA was taking money from a man of the British Army.

Without wasting time, she quickly gave the news to Netaji Subhas Chandra Bose. Netaji was impressed on her for good presence of mind and intelligence. For that reason, Netaji started to call her Saraswati.

Along with that, he allowed Moni Raman to join the regiment of the INA. Six months later Netaji decided to send Moni Raman and Durgawati Devi (known as Durga Bhabi) to the British Camp. They hide their identity there and started working there like men. Soon, they gathered information about the World War II and gave all information to the INA with the help of local people. However they could not continue their mission long time because Durgawati Devi got arrested by Britishers. After the incident one day day, Mani Raman went to prison as a local person to meet Durgawati Devi and made a plan to escape her from her imprisonment.

In order to make the plan successfull, they two ran away from prison. Britishers fired a bullet on her right leg and she got injured. However, the bullet could not stop her and they two climbed up a tree and stayed there for three days.

Moni Raman walked 7KM with Durgawati Devi and went to the camp of the Indian National Army in Rangoon. At that time Netaji was not there.

Though Netaji Subhas Chandra Bose was not there, he wrote a letter to Mani Raman and expressed that he was very proud of her. He also wrote in the letter that Mani Raman had become the youngest spy of INA.

The journey of a girl from a nurse to the youngest spy is inspiring to all countrymen. The story of Mani Raman inspires and influences every woman. This is a story of courage, a story of love for our motherland.

Saraswathi Rajamani,
India's First Female Spy

CR DAS'S UNTIMELY DEMISE

PABRISHA DAS

On the day of 16th June,1925; a great soul of Motherland, Sir Chittaranjan Das popularly known as Deshbandhu (Friend of the Nation) passed away. "If You are born, you have to die" is universally true and natural. But was it only a sudden death only due to overwork? Isn't it quite shocking? The person who went for change, died suddenly instead of getting well; although staying in supervisions?

Was that sudden death due to only overwork? Or there's something more? Sir Chittaranjan Das with Mahatma Gandhi and Anne Beasant went at the Hill Cart Road near Kakjhora, Darjeeling in 1925 to recuperate his health by staying at N.N Sircar's house, named "Step Aside" But what was the relation between Sir CR Das and Sir N.N SIRCAR? How did they know each other? After staying in supervisions too, how did he suddenly died? Then was it pre-planned?

Well, there are no answers for this still now. We people without any doubt believe that his death was of course a reasonable one. May be that it was the real reason for his death. Or maybe not. But when we doubt the reason for his death, we remember about the message that Gandhi left for Sir CR Das.

We can't assure that it was a dirty game played by someone or not. "When I left Darjeeling, I left much more that I had ever thought before. There was no end of my affection for Deshbandhu and my warm feeling for such a great soul" Was Gandhiji really so much sympathetic for Sir CR Das's demise? However, if we accept the sudden demise of our leader, how can anybody forget about Smt. Basanti Devi? She herself had a own strong identity other than being wife of Sir CR Das. But do we know what happened to her after his death? Did such a strong women leader stop her independent activities just

after her husband's sudden death? We don't know that why we don't know about her activities after 1925. No history books are being published with a note of her works further than 1925. May these unknown histories get printed in books and may this unknown history be known to all countrymen.

দেশনেত্রী লীলা রায়

SNEHOJIT ROY MITRA

আমরা ইতিহাস নিয়ে চর্চা করলে জানতে পারি যে ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। ইতিহাসের নায়ক হিসেবে আমরা বারে বারে দেখতে পাই পুরুষদের। ইতিহাসের মধ্যেও বিপ্লব হয় আর সেই বিপ্লবের মধ্যেও কিন্তু নারীদের অকল্পনীয় ভূমিকা আছে, আর সেই ভূমিকা আমরা জানতে পারি না; একটা অন্তরালের মধ্যে রাখা হয় যেন তাঁদের। আর আজকে সেই এক "অগ্নিযুগের কন্যা" লীলা রায়ের সম্পর্কে লিখবো। তিনি অসমের গোয়ালপাড়া শহরে ২ অক্টোবর ১৯০০ সালে এক মধ্যবিত্ত পিরবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম হলো গিরিশচন্দ্র নাগ যিনি পেশায় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তার পিতৃ-পরিবার ছিল তৎকালীন সিলেটের অন্যতম সংস্কৃতমনা ও শিক্ষিত একটি পরিবার।এই মহীয়সী নারীর পৈতৃক নিবাস বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রামে। তারা ছিল ওই সময়ে পরিবার বৃহত্তর সিলেটের খুব পিরিচত সংস্কৃতমনা ও উচ্চশিক্ষিত।

১৯১৬ সালে লীলা রায়ের পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ চাকরি হতে অবসর গ্রহণর পর স্থায়ীভাবএ সপিরবারে বাংলাদশে চলে আসেন। ১৯১৭ সালে ইডেন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তবে ১৯১৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর লীলা রায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন। পড়াশোনায় তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ করার জন্য আপিল করেন কিন্তু একই বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এম এ করার জন্য ভর্তি হন। তখনো ঢাবিতে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল না। তার জেদ, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়বেন। মেয়েরা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারবে না এই মর্মে লীলা রায় ঢাবির চ্যান্সেলর (বাংলার গভর্নর) ও ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে দেখা করে নিজের কেস প্লিড করেন। তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর পি জে হার্টর্জ লীলার মেধা ও আকাক্ষা বিবেচনা করে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার বিশেষ অনুমতি দান করেন। ঢাবিতে তাঁর ভর্তির ক্রমিক নাম্বার ছিল ২৫। এভাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং অর্জন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী হওয়ার গৌরব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাবস্থাতেই লীলা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও ঋষি রামানন্দের সাহচার্জ লাভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি ইংরেজিতে ২য় বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম এ ডিগ্রিধারী।

এরপর শুরু হলো নারীশিক্ষার উন্নতি, শিক্ষাজীবন শেষ করে লীলা নারীশিক্ষার প্রসার ও স্বদেশের স্বাধিনতা আদায়ের

আন্দোলনে ব্রতী হন। নারীদের অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য ১২ জন সংগ্রামী সাথী নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন 'দীপালি সংঘ'। এই সংঘের মাধ্যমে তিনি দীপালি স্কু ল ও আরো ১২টি অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া নারী শিক্ষার অগ্রগিত জন্য তিনি নিজে কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, এছাড়াও ঢাকার আরমানিটোলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও তিনি করেছিলেন। বিয়ের পর লীলা কলকাতায় চলে যান এবং সেখানেও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এছাড়াও তিনি দীপালি ছাত্রী সংঘ ও মহিলা আত্মরক্ষা কেন্দ্রও গড়ে তোলেন। বিপ্লবী পুলিন দাসের নতৃত্বে মেয়েরা এখানে অস্ত্র চালনো ও লাঠিখেলা শিখতেন।

১৯৩১ সালে বপ্লবীদের কার্যকলাপ আরো জোরদার হয়। পরপর বেশ কিছু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা জজ বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। এর মধ্যে কুমিল্লার জেলা জজ স্টিভেন্সের হত্যার সাথে দু'জন তরুণী জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে।

এরপর বিয়ের মাত্র ১৩ বছরের মাথায় অকাল বৈধব্য ও বহুদিনের আন্দোলন- সংগ্রামের সাথীকে হারিয়ে শারীরিক ও মানিসকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন লীলা। তবে কম সময়ের মধ্যেই শোক কাটিয়ে স্বদেশের বৃহত্তর স্বার্থে পুনরায় মনোনিবেশ করেন তিনি। ১৯৫২ সালের খাদ্য আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন।

১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সকালে তিনে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাকে কলকাতার পি পি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২৩ দিন পর সংজ্ঞা ফিরে এলেও বন্ধ হয়ে যায় তাঁর বাকশক্তি। শরীরের ডান অংশ সম্পূর্ণ রূপে অচল হয়ে যায়। এভাবেই আড়াই বছর চলার পর ১৯৭০ সালের ১১ জুন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এই মহানায়িকা পরলোকে গমন করেন।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দলনে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতের প্রভাব

Soumyadipta Bose

Soumyadipta is a Social Worker and Founder of Centre for Integrated Developmental Practices, S24PGS. He is the curator and mentor for Free educational and cultural centres all around West Bengal.

আশ্বিনের সকাল। পাখির কলতানে মুখর এমন চেনা মুহূর্ত আগেও দেখেছে বাংলা। শিশির ভেজা ঘাসগুলো তখন যেন ঘুমে আবিষ্ট। কিন্তু তবুও আজ সকালটা খুব বিশেষ, চেনার মধ্যেও অচেনার গাম্ভীর্য। সহসা কুয়াশার পাঁচিল টপকে মৃদু আওয়াজ ভেশে এল। কাছে আসতেই বঝা গেল কোন এক শোভাযাত্রার সমবেত সঙ্গীত। উদাত্ত কন্থে 'বাংলার মাটি বাংলার জল/বাংলার বায়ু বাংলার ফল/ পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান' গেয়ে চলেছেন শোভাযাত্রীগণ। অবিরাম শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনির মধ্যেও স্বতন্ত্র সেই গান, সুরে একটুও ছেদ নেই। বাড়ির ছাদ, ফুটপাথ উপছে পড়েছে ভিড়ে। লোকারণ্য যেন। শিশু, মহিলা, যুবক, তরুণ, তরুণী কে নেই সেই শোভাযাত্রায়। হাজার হাজার মানুষের সেই জনসমুদ্রের স্বল্প বিবরন দিয়েছেন গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন। 'শোভাযাত্রার সর্বপ্রথমে একটি অল্পবয়স্ক বালক একটি সুস্থকায় ভদ্রলকের স্কন্দে চড়িয়া, হাআত তুলিয়া সুললিত কন্থে গাইতেছে- বাংলার মাটি। আর সকলে সহস্র কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করিতেছে। সে বালকটি, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের শিশুপুত্র- অধুনা মহারাজ'[১] কিন্তু কাকে দেখবার জন্য ভিড় আছরে পড়েছে রাজপথে? কিই বা উপলক্ষ? মিছিলের অপর এক মুখ অবনিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, 'সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল।'[২] রবিকাকা মানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন দীনেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ আরও অনেকে। গন্তব্য জগন্নাথ ঘাট। পূর্বপরিকল্পনামত গঙ্গার পুণ্য জলে স্নান শেরে যখন উঠে এলেন রবীন্দ্রনাথ, চারিদিকে তখন সে কি এক ধুম। একে অপরকে কলাকুলি করে পরিয়ে দিচ্ছেন হরিদ্রাবর্ণের রাখী। সর্বধর্ম নির্বিশেষে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল রাখিবন্ধন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, '...সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলেমেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়েছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে।[৩] আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এ ঘতনার বিস্তৃতি ব্যাপক। যার সুত্রপাত দুবছর পূর্বে ১৯০৩ সালে, এবং চরম পরিণতি আজকের এই রাখিবন্ধন উৎসব।

ভারতবর্ষকে নিজের গলামে পরিণত করার কাজ দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশরা শুরু করেছিলো, কিন্তু বারবার বাধ সেধেছে এই বাংলা। অখণ্ড বঙ্গের মানুষজনের একাত্মবোধ, একে অপরের প্রতি ভাতৃসুলভ মনোভাব ব্রিটিশকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে বছরের পর বছর। অবশেষে কূটচক্রী বড়োলাট কার্জন গলার কাঁটা বাংলাকে গলঃধকরন করার এক উপায় বার করলেন। বাংলা ভাগ। সুবিশাল এই বাংলার প্রশাসনিক কাজের অপ্রতুলতার ছলে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রস্তাব রাখলেন বঙ্গভঙ্গের। সিদ্ধান্ত হল পূর্বাংশ যাবে আসামের সঙ্গে আর পশ্চিমাংশ বিহার, ছোটানাগপুর ও ওড়িশার সঙ্গে। অতএব সাপও মরল ও লাঠিও ভাঙলো না। ব্রিটিশ হায়নার লোলুপ দৃষ্টি সেদিন থেকে বাংলাকে কুড়ে কুড়ে খেতে লাগলো। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর Calcutta Gazette-এ প্রথম প্রকাশিত হল সেই দাম্ভিকতার আক্ষরিক বর্ণনা-দ্বিখণ্ডিত হবে বঙ্গদেশ। কার্যত শোরগোল পড়ে গেল বাংলা জুড়ে। অথচ বেশ কিছুদিনের মদ্ধেই সে ঢেউও মিলে গেল সময়ের অমোঘ

নিয়মের কষাঘাতে। এদিকে সুযোগ বুঝে লন্ডন গিয়ে কার্জন কেবল তৎকালীন ভারতসচীব ব্রেডরিককে স্বমতে আনলেন না, নিজেকে পুনর্বহাল রাখলেন ভাইসরয় পদেও। অবশেষে ৫ জুলাই ১৯০৫ লন্ডন থেকে রয়টারের টেলিগ্রাম এল – বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রস্তাবে ভারতসচীব তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন। ২০ জুলাই এই বঙ্গবিভাগের খবর কালো বর্ডার দিয়ে আড়াই কলামব্যাপী প্রকাশ করলেন The Bengalee পত্রিকা। মিলিয়ে যাওয়া ঢেউ যেন আবার কিসের ধাক্কায় ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করলো। পথে নামলো বঙ্গবাসী। এগিয়ে এলেন বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ। নেতৃত্ব দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সেই দিনগুলোতে নিছক একাত্মবোধই নয়, আক্ষরিক অর্থেই পুরোধা নেতৃত্বের নিশানটিও তিনি তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধেই' (৪)। আন্দোলনের সাল যে কেবল পথে নেমেই ধরা যায় তা আক্ষরিক অর্থে ভুল প্রমাণ করলেন তিনি। বললেন '... বক্তৃতা ও সাহিত্য দিয়ে কার্য করিবেন' (৫)। অথচ উপেক্ষা করতে পারলেন না শারীরিক উপস্থিতিকে, তাঁর গৌরবোজ্জ্বল অংশগ্রহন প্রতিটি সভা সমিতি, কে করে তুললো স্বয়ংসম্পূর্ণ। মননিবেশ করলেন সঙ্গীত রচনায়। আন্দোলন উন্মাদনার ঢেউয়ের অভিঘাতে তিনি রচনা করলেন ২২/২৩ টি স্বদেশপ্রেমমূলক গান। মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো দেশপ্রেমমথিত আবেগতাড়িত সেই গান। গান শেখার সে কি উদ্দীপনা তরুণ তরুণীদের মধ্যে। এই ঘটনার আভাস পাওয়া যায় অমৃতবাজার পত্রিকার ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সালের সংখ্যায় একটি বিজ্ঞপ্তিতে, 'Dawn Society Music Class – A temporary Music Class, to teach a number of the newest national songs composed by Babu Rabindranath Tagore will be opened immediately under the auspices of the 'Dawn Society'

৭ আগস্ট ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলকাতার টাউন হলে বসল এক বিরাট জনসভা। যেন চাঁদের হাট। কিন্তু দরকার গান, কারন 'একশটি সভা যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে একটি গান পারে তার চেয়ে বেশি'। সুতরাং সহায় হলেন রবীন্দ্রনাথ। অতুলচন্দ্র গুপ্তের কথায় 'টাউন হলের বিরাট জনসভায় গাইবার জন্য গান দরকার। এল আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। টাউন হলের ঐতিহাসিক সভা প্রসঙ্গে সত্যেন রায় তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'কলিকাতার টাউন হলে যে সভা হয়েছিল, সেই উপলক্ষে....রবীন্দ্রনাথের নূতন সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' বাউল সুরে গীত হয়েছিল'। রবীন্দ্রনাথের গান যেন বাংলার মনে মিশে গেল, বাংলার ঘরে ঘরে সোনা যেত আমার সোনার বাংলা, পথে পথে সোনা যেত 'বাংলার মাটি বাংলার জল'। টালমাটাল যে সময়ের রাঙা আকাশ আরো গূঢ়তর হল ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ যখন সরকারি তরফে সিমলা থেকে ঘোষণা হল আর আর ঠিক দেড় মাস পরে ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে। আবারো জোয়ার। বাদ পরলো না ছাত্রছাত্রীও। ৩ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে চার,আচারটা চারটায় কলেজ স্কোয়ার এ চারহাজার মানুষের উপস্তিথিতে অণুষ্ঠিত হল শপথ গ্রহণ পর্ব। আজ থেকে আর কেউই ব্রিটিশদের তৈরি কোন জিনিস ব্যবহার করবে না। এমনকি তিনদিন ধরে পালিত হবে জাতীয় শোক। সভাশেষে মিছিল এগিয়ে চল্ল। আর মুখে লেগে সেই পরিচিত রবীন্দ্রসংগীত। বিপ্লবী প্রাণের আশা ভরসা। ঘটনাটি দা বেঙ্গলী পত্রিকায় পরদিন ছাপা হয়।, '...college and school students, barefooted and holding flags in hand came in procession singing a national song composed by Babu Rabindranath Tagore'. তবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ কেবল বিদেশি দ্রব্য নয় বিদেশি রীতিনীতি পরিত্যাগের পক্ষেও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'করতালি' ও 'শকচ' প্রবন্ধ দুটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রস্তাবে এও উঠে আসে যে - দেশের ভিক্ষুক সম্প্রাদয় যেমন সহজ ভাষায় ও সুরের মধ্যে দিয়ে গূঢ় ধর্মীয়ত্তব দ্বারে দ্বারে পরিবেশন করেন, ঠিক তেমনি দেশের মানুষকে জাগ্রত আমাদেরও শখের ভিক্ষুক দল গড়ে তোলা উচিত। যারা গ্রামে ঘুরে স্বদেশী গান গেয়ে কেবল দেশাত্তবধক প্রচার নয়, ন্যাশনাল ফান্ড এর জন্য অর্থও সংগ্রহ করবে। গড়ে উঠলো 'বন্দেমাতারাম সম্প্রাদয়'।

সভাপতি নিযুক্ত হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং সহসভাপতির পদ অলংক্রিত করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাশ ও শরৎচন্দ্র রায়। কিন্তু কি গাওয়া হবে? আবারো মনোনিবেশ করলেন সংগীত রচনায়। লিখলেন, 'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'দিনেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আমরা একটি বৈতালিক দল গঠন করে রোজ সকালে স্বদেশী গান গেয়ে ন্যাশনাল ফান্ডের জন্য টাকা তুলতে লেগে গেলুম' (৯)।

রবীন্দ্রনাথের গানের পাশাপাশি বক্তৃতারও চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো।এমনকী ৯ অক্টোবর পশুপতিনাথ বসুর গৃহে বিজয়া দশমী উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় ভাষণের জন্য তাঁকে গিরিদি থেকে ডেকে আনা হয়। স্বভাবতই সেই সভার অঙ্গ হিসাবে গীত হয়ছিল রবীন্দ্রসংগীত। দ্য বাঙ্গালী পত্রিকার কথায়, '.....Babu Rabindra Nath Tagore also sang an appropriate song specially

composed for the occasion which was much appreciated by the vast assembly'. সভা সমিতির আয়োজনে কোন খামতি নেই। একের পর এক নতুন আদর্শকের সামনে রেখে বঙ্গবাসী প্রস্তুত হচ্ছিল ব্রিটিশ এর সাথে আপাত সম্মুখ সময় অবতীর্ণ হতে। আর এই আগুনে গ্রিতাহুতির কাজ করে চলেছিল গূঢ়চেতনাময়ী দেশাতবধক রবীন্দ্রসংগীত। রামেন্দ্রাসুন্দর ত্রিভেদির মতে, 'স্বদেশীয়দের আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ এর লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই'। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, কলকাতার স্বধর্ম সাধন সমিতির ডাকে বিকেল ৬টায় অক্রুর দত্ত লেনে আয়োজিত হয় এক বিশেষ অধিবেশন। বাংলা তথা ভারতের প্রায় সকল গুণী ব্যক্তির সমারোহে সভাটির মাহাত্ম্য বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল তা বলা চলে। সভাপতির পদে অলঙ্কৃত করলেন কবি স্বয়ং। কে ছিলেন না বিহারীলাল সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে শুরু করে অমৃতলাল বসু, ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ একঝাঁক উজ্জ্বল মুখ। সহ্যের ভঙ্গুর বাঁধ ছাপিয়ে উপছে পরলো ক্রোধের জলরাশি। ক্ষোভে ফেটে পড়ল সমগ্র বঙ্গ। ঠিক হল সরকারের স্বার্থান্বেষী সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় ও বঙ্গভঙ্গ রোধে আগামী ১৬ই অক্টোবর সমগ্র বঙ্গদেশজুড়ে পালিত হবে রাখীবন্ধন উৎসব। অধিবেশনের পরের দিন অর্থাৎ ২৮শে সেপ্টেম্বর দ্য বেঙ্গলি পত্রিকা লিখলেন, '... if partition of Bengal were carried out on the 16th October next the people of entire Bengal Eastern and Western, should celebrate the day as an occasion of their union. That might be observed as an anniversary and Rakhi Bondhon, by exchange of yellow thread between people of Eastern and Western Bengal on that day, might be observed'. এমনকি সভাশেষে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হয়েছিল সে বিবরন দিতেও ভলেননি বেঙ্গলি কর্তৃপক্ষ। ১লা সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলো বঙ্গভঙ্গের দিন আর ঠিক তার একমাস পর অর্থাৎ ১১ই অক্টোবর বঙ্গবাসীর সম্মিলিত আহ্বান রাখীবন্ধন উৎসব। স্লোগান উঠল 'ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই'। এছাড়াও কোথায় রাখী পাওয়া যাবে সে নিয়েও বিস্তারিত জানিয়ে দিল বেঙ্গলি, '...rakhi threads are now being sold at the Bhandan office No 7, Cornwallis Street, Calcutta' (13th October, 1905)। সমগ্র উৎসবটির সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রইলেন কবি। বলা যেতে পারে এ উৎসব তাঁরই মস্তিস্কপ্রসূত। লিখলেন গানও। অতুলচন্দ্র গুপ্তের কৈশোর সিম্রতিতে উল্লেখ্য, 'প্রথম রাখীবন্ধনের গান চাই। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' প্রস্তুত'। অবশেষে ১৬ই অক্টোবর পূর্ণতা পেল রাখীবন্ধন উৎসব। এক্সুত্রে মিলিত হল আপামোর বাঙালি। ব্যার্থতার হাহাকারে সেদিন বুক চিরে গেল ব্রিটিশ পাষণ্ডদের। উচিত শিক্ষা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকল সেদিন বিকেলেও। আপার সার্কুলার রোডে বসলো বিরাট জনসভা। সভাপতি হিসাবে জনতা বরণ করলেন আনন্দমোহন বসুকে। অসুস্থতা সত্ত্বেও কেবল প্রানের টানে ছুটে এসেছিলেন সেই জনসভায়। সভা সমাপ্তিতে জনতা আবার এগিয়ে চলল পশুপতি বসুর বাড়ির দিকে, মুখে গুঙ্গুন সুরে, 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান/ মোদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে এতই অভিমান'। কেবল গাঙ্কে প্রানের অজেয় মন্ত্র করে একটা জাতি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সেইদিন ক্ষমতার উৎস ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। নিরস্ত্র অথচ নিরভিক, নগ্ন পায়ে মিছিলের পর মিছিল, সভার পর সভা অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশের ঘুণধরা অট্টালিকার। তাঁদের পাথেয় কেবল গান। রবীন্দ্রনাথের গান। অতুলপ্রসাদ সেনের কথায়, 'সে সময় বঙ্গে যে দেশপ্রীতির স্রোতে বহিয়াছিল তাহার উৎস রবীন্দ্রনাথের গান'।

সূত্রনির্দেশে –

১। অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গভঙ্গ: সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৯, অক্টোবর ২০০৫, পৃ ৯৩

২। অনুত্তম ভট্টাচার্য, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৯, অক্টোবর ২০০৫, পৃ ৪৩

৩। তদেব, পৃ ৪৩-৪৪

৪। ভব রায়, রবীন্দ্রভাবনায় অখণ্ড বাংলা ও অখণ্ড ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৪১-৪৬, এপ্রিল-মে ১৯৯৮, পৃ ১০

৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ, বিশ্বভারতী, ১৩৯২ বঙ্গাট্টোপাধ্যায়

৬। অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গভঙ্গ: সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৯, অক্টোবর ২০০৫, পৃ ৮৯

৭। তদেব, পৃ ৯১

৮। অনুত্তম ভট্টাচার্য, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৯, অক্টোবর ২০০৫, পৃ ৪৪

৯। তদেব, পৃ ৪৮

১০। অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গভঙ্গ: সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৯, অক্টোবর ২০০৫, পৃ ৯১

১১। তদেব, পৃ ৮৯

১২। তদেব, পৃ ৯৩

Why 8/12,

The Movie that might actually be one of the most accurate representations of Revolution

Film: 8/12: Binay Badal Dinesh
Genre: Dramatic, History

Where does a revolution start from? Why is a fight always seen bleeding in every page of history? Well, the answer is metaphorically hidden in a film that you probably missed.

While there is enough flare with several contemporary films like Jai Bheem, Udam Singh and Kashmir Files, 8/12 stood out as the only Bengali film to portray the power of revolution against imperialism and against misused authority. Here I have deconstructed the movie into bits, so while you enjoy this film as a reader, do pay for it and watch it, as it would help supportsimilar art and historic portraits painted before the majority audience.

The main course of the cinema shows the upbringing, development and struggle involved in the lives of the three main revolutionaries, Binoy Bose, Badal Gupta and Dinesh Gupta, and the attack on Writer's building, 8/12, which gives the name to the movie.

From the starting scenes, the tension of the period of Indian Independence Movement is upheld, as the British Police and intelligentsia are shown cracking down on small units of resistance groups with harsh methods. Charles Tegart, former Police Commissioner of Kolkata, and F.I. Lowman, Inspector General of Police converse about slashing open these groups.

There were three groups as mainly referenced by many historians, which find mention in this film, namely The Bengal Volunteers, The Anushilan Samiti and The Jugantor party. The Group in question, is the Bengal Volunteers. On one side the volunteers, mainly youth wings, are shown to be hunted down as they flee. The school absentees are detained. The books have inscribed cavity to capacitate pistols. The special emphasis here, was shown, on how women were shown. Intense British Interrogation kept on occuring, as the Nirmal Sen Camp is being referred to. Bones ripped off, scenes of rape were bone-quivering for the viewers, showing why the flame of revolution had lit up amidst young boys and girls. Unlike the present society, which is stagnant on its views of crimes, the period was of unrest.

Scene shifts to a man enquiring a fisherman about the last ferry, which turned out to be the code word for the group, as they led to arms practice ground and eventually boiled down to a conversation with Major Gupta of volunteers. "Better to be brutal than handicapped", says he. While talking about the return of Subhash Bose, their motive to ward off this torture was via creating fear in the minds of the British. Working on the said path of action as devised by Rashamay Sir, a premise is set up, where initially telegraph and telephone communication lines are sabotaged. This is where Badal is introduced, sabotaging poles with a slingshot. On the other hand, Simpson fills up the jails from Alipore to Dhaka with suspected students. A distressed Kamala is raped brutally as she begged for her brother's life. He was apparently dying of thirst, and even after Kamala was brutally abused on mud, she didn't fail to collect the moisture from the soil within her saree. This stands as an elemental proof of the devotion of the workers.

These issues bring tempest of emotions within the Indians, unlike the present day, as one of the activist and leader of the volunteers, Ananta Singha surrenders, not being able to bear all the abuse his brothers and sisters had to face. The penalty of Lowman's miscreant behaviour is decided to lead him to death. Binoy Krishna Bose is then assigned with the duty of shooting that rascal officer to death.

The news that Lowman is going to come to Mitford Hospital is given away by a spy in the British army to the volunteers through a local panwadi, and then Shri Hemchandra Ghosh makes the perfect plan. Lowman is shot dead with chants of vande matram, as Binoy keeps sprinting the entire time and escapes with decoy men, as a bit of support from an Indian working for the British Police. The British Police becomes repeatedly fooled, as they falsely interrogate someone of their own side, while a man escapes the town in a Muslim's outlook. (Intermission sets within this suspense) Next up, a violent rod-rape and dry chilli powder insertion, which will immediately gain the traumatic side of viewers. On the other hand, Binay meets with Shubhash where he asks from Him for two others who don't fear death or to kill. He is prepared for the ultimate sacrifice and accepts the point of no return.

Now, Dinesh is introduced to the audience. Dinesh protests and is not fear to be shot in his heart. Selected now for the Bengal Volunteers, he pledged to do his duty, as the room mates interact.

Jail incident where Major Gupta is shown. This brilliant dialogue, which is also showed in the trailer, happens here - "Apni apnar kortobbonpalon korben bole amra to amader kortobbonpalon theke shore darate parina"

BBD trio practice shooting and yoga as they prepare for the D Day at Writers building. Metia bruj is assigned to Binay while Badal and Dinesh to Park Street. They sleep and discuss about food when they are notified of the duty.

Binay missed her mom and feels for all Mothers of the Nation. They prepare, as they consume their last meals. Binay looks at a picture of mom for the last time and depart with the vande matram cued at background. They get up in an ambassador, and viz khidirpore, reach BBDbagh. They are told not to hurt innocents. "Keep bullets and cianide for last"- the commander of the operation BBD BAGH suggests . From a certain cigarette company they reach the Writers.

The final shootout happens and they laugh in the face of death. Bullets fly from all sides. They spare a pregnant British Woman, showing the difference between revolution and brutality. As the backup forces arrive, the trio are already done with their targets. However now is the point of no return. One hit in the leg, on on the neck, most out of bullets. "I come I see I conquer. Vini Vidi Vici" one dies, saying it's best for the future. Last of the trio was shown to die, for smoothness within the dramatization. Screen shows accurate death details in the end- Dinesh in real life suffered capital punishment.

The film was ended with a round of applause from all the audience.

Current Real Life status :

We all know how there are several perspectives to an incident. One vigilante group purely intended for ensuring justice might be a terrorist group for another. In a listing in the Hansard Parliament website, these groups are named as terrorists. The building of Writers is abandoned still, and the place gets respected with the revolutionary initials, BBD BAGH. The revolutionaries are remembered on Martyrs by many on the Eighth of December.

KSS Productions and Entertainment have not been well known producers within the majority of mainstream demand in the Indian film industry. Their film is going to be a stepping stone for other newbies to go mainstream. Rating their direction and acting a 9/10 and a 9.5/10 for the accuracy of the events.

Ending this review with my favourite quote from the movie- "History matters less, but the action that you do now matters more".

"Vini

Vidi

Vici"

চিত্রকলা

"Digital Illustration of Netaji Subhas Chandra Bose and Adolf Hitler"
By **Rajdeep Saha**

"Digital Sketch of Netaji Subhas Chandra Bose"
By **Pabrisha Das**

“Illustration of Netaji Subhas Chandra Bose”
By **Sukanya Majhi**

"Sketch of Netaji Subhas Chandra Bose"
By **Debanwita Chakraborty**

“Drawing of Netaji Subhas Chandra Bose”
By **Niharika M.S**

"Digital Sketch of Netaji Subhas Chandra Bose"
By **Rajdeep Saha**

How To Reach Us?

Mail Us At:
contact@forwardwebzine.org

Mailing Address:
33A, Sodepur Brick Field Road, Kolkata -700082

Submit Articles At:
forward.editorial@gmail.com

General Enquiries:
abhinaba@forwardwebzine.org

Copyright Issues And Advertisement:
rounak@forwardwebzine.org

Contributors:

CONTRIBUTORS:

KANKANA GHOSH // SOUMYADIPTA BOSE // NAJMIN SULTANA HAQUE SEN // SUBHAM SEN // RAJDEEP SAHA // AMRIT BHATTACHARJEE // PABRISHA DAS // SOMOSHREE PALIT // PATRALEKHA KARMAKAR // SNEHOJIT ROY MITRA // KAU-SANI SAHA // SONELA SUNGUPTA // ANNWAYA SARKAR // ARNAB BANERJEE // SAMYAK JAIN // SHOURJYO GHOSHAL // VIKRAM BANSAL // SUKANYA MAJHI // DEBANWITA CHAKRABORTY // NIHARIKA M.S

OUR TEAM:

ABHINABA BOSE // AMIT CHAKRABORTY // ANAL KUMAR MITTRA // AMRIT BHAT-TACHARJEE // RAJDEEP SAHA // PATRALEKHA KARMAKAR // KOYENA CHATTERJEE // SNEHOJIT ROY MITRA // ROUNAK CHAKRABORTY // PREETHA BOSE // SOMOSHREE PALIT // SAGNIK GHOSH // PABRISHA DAS // SAYANI BANERJEE BHATTACHARJEE // MANALI CHAKRABORTY // SWARNADEEP SARKAR // SREEJITA GHATAK // ASHMITA DAS

Who Are We?

Margaret Mead in all her wisdom said that a small number of thoughtful, committed people could change the world and it is the only thing that ever has. We are a group of like minded students, who want to change history with the power of our words and voices. And we are here to create one too. Committed to the ideals of Netaji, ours' is a small, earnest attempt to give back the Liberator the justice that has hitertho been denied, that he always deserved. We are nothing without you. And together, we can bring a revolution.

Special Thanks To :

Bijoy Kumar Nag // NG Bannerjee // Dr. Madhusudan Pal// Indrasish Bhattacharya // Kunal Bose // Kandari Youth Programme // Jayasree Patrika Trust // Dr. Saurabh Garai // Netaji Janmotsab Committee (2020-22) // A Kr Mitra // Kankana Ghosh.

A Flaming Sword: Holding aloft a ceremonial Japanese sword, Tokyo, November 1943